ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
এপ্রিল, ২০০৭।

গবেষক

নিঘাত সুলতানা
রেজিস্ট্রেশন নং-১৫৩,
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০০-২০০১
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Library
436748
436748

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

উৎসর্গ

আমার একমাত্র সন্তান
মোঃ আল-জাওয়াদ হাসান (আনাস)

436748

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত ঢাকা বিভাগ" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব, আমার জানা মতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই গবেষণা কর্মটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

নিঘাত সুলতানা

ঢাকা
১১.০৪.২০০৭

নিঘাত সুলতানা
এম. ফিল গবেষক
রাষ্টবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

436748

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Dil Rowshan Zinnat Ara Nazneen
Professor and Chairperson
Department of Peace and Conflict Studies
Dhaka- 1000, Bangladesh

E-mail:dusregstr@bangla.net
Fax: 880-2-8615583
Phone : 880-2-8612792 (Res)

নং----------

তারিখ----------

প্রত্যয়ন পত্র

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে "ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত ঢাকা বিভাগ" শীর্ষক গবেষণা কাজটি নিষাত সুলতানা (রেজিঃ নং-১৫৩, শিক্ষাবর্ষ ২০০০-২০০১) আমার তত্ত্বাবধানে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য সম্পন্ন করেছে।

আমার জানা মতে গবেষক এ গবেষণা প্রতিবেদনটি অথবা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করেননি। গবেষণা প্রতিবেদনটি এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য সুপারিশ সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপস্থাপন করা হল।

২১/৪/০৭

ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রী সমাজও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মাতৃভাষার প্রশ্ন নিয়ে যখন আন্দোলন শুরু হলো, তখন ছাত্রী সমাজ এবং নেতৃস্থানীয় মহিলারাও এ আন্দোলনে অংশ নেন। আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্ব থেকেই বেশ কিছু ছাত্রী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ছাত্রী বা নারী সমাজ যুগ যুগ ধরে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সকল সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ঘটলেও ছাত্রী বা নারীদের প্রত্যাশিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। অথচ পুরুষের চেয়ে ছাত্রী বা নারীরা কোনো অংশেই কম নয়। এই গবেষণাকর্ম থেকেই আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীরা তাই ধূমকেতুর মতো উদয় হলেও তাদের সেই সময়ের ভূমিকা ও অবদান ছিল সুগভীর। এক্ষেত্রে নাদেরা বেগম, হামিদা সেলিম, হাজেরা মাহমুদ, সুফিয়া খান, রওশন আরা বাচ্চু, হালিমা খাতুন, সুফিয়া আহমেদ ও কাজী খালেদা খাতুনের মতো নির্ভীক নেত্রীর নাম উল্লেখ করতে পারি- যারা এখনও আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। যদিও এদের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। কারণ রক্ষণশীল ও কুসংস্কারপূর্ণ সামাজিক কাঠামোর নাগপাশে আবদ্ধ থাকার ফলে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছাত্রী বা নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। আর এ সত্য অনুধাবন করেই ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রী বা নারী সমাজকে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই আমি গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছি। পরিশেষে গবেষণার প্রাণ ছাত্রী বা নারী সমাজকে মূল্যায়ন করতে হবে সমঅধিকারের ভিত্তিতে। ছাত্রী বা নারীদের সুপ্ত প্রতিভা ও রাজনৈতিক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আরো বিকশিত করবে- যা একজন সচেতন ছাত্রী হিসেবে এটাই আমার কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহ তা'লার প্রতি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা সমর্পণের মধ্য দিয়ে আমি গবেষণা কর্মটি করেছি। কারণ একটি গবেষণা কর্ম সম্পাদনের জন্য যে মেধা ও প্রজ্ঞার দরকার হয় তার পুরোটাই আমি সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পেয়েছি।

গবেষণা কাজের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ সময়, অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতা, সাথে সাথে বিভিন্ন উৎস হতে গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা দরকার, এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন ও অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন- যার সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে আমি গবেষণা কর্মটি রচনা করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস তার সাহায্য সহযোগিতার জন্য আমি গবেষণা কর্মটি শেষ করতে সক্ষম হয়েছি।

গবেষণা কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য আমার পরিবার হতে আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার বাবা-মা ও শ্বশুরকে। কারণ বাবা-মার উৎসাহে গবেষণা কর্মটি শুরু এবং শ্বশুরের সাহায্য সহযোগিতায় সমাপ্ত করতে পেরেছি। এছাড়া উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হালিমা খাতুন ও রওশন আরা বাচ্চুসহ যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। উপাত্ত সংগ্রহের কাজে আমাকে সার্বিকভাবে সময় দিয়েছে আমার ছোট ভাই তুল্য মো. সোহেল রানা। সেজন্য আমি তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করার জন্য মানসিকভাবে উৎসাহ দিয়েছে আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী মোঃ আবুল হাসান ও আমার আট মাসের সন্তান যাকে আমি অনেক কষ্ট দিয়েছি। তাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। এছাড়া আরও একজন যিনি সর্বদা আমার পাশে থেকেছেন এবং আমার সন্তানের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন তিনি আমার খালা আনোয়ারা বেগম। তার কাছে আমি চিরঋণী। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও সি. এম.

Dhaka University Institutional Repository

তারেক রেজা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ছবি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, তার প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণার জন্য ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যেসব মনীষীদের বই, জার্নাল ব্যবহার করেছি তাদের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনারের সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা এবং গবেষণা কর্মটির মুদ্রণ কাজে সার্বিকভাবে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইল আমার ধন্যবাদ।

সময় স্বল্পতার কারণে আমার গবেষণা কর্মে যদি কোন ভুল ত্রুটি রয়ে যায় তবে তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

নিঘাত সুলতানা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়		
	ভূমিকা	১-৬
	গবেষণার উদ্দেশ্য	৭-৯
	গবেষণা পদ্ধতি	৯
	সীমাবদ্ধতা	১০
	প্রয়োগক্ষেত্র	১০-১১
	উপসংহার	১২
দ্বিতীয় অধ্যায়		
	ভাষা আন্দোলনের সূচনা	১৩-১৮
তৃতীয় অধ্যায়		
	ভাষা আন্দোলনের ১ম পর্যায় (১৯৪৭-১৯৫১)	১৯-২৮
চতুর্থ অধ্যায়		
	ভাষা আন্দোলনের ২য় পর্যায় (১৯৫২-১৯৫৬)	২৯-৩৭
পঞ্চম অধ্যায়		
	ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার	৩৮-৭৪
ষষ্ঠ অধ্যায়		
	ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী (যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি) ছাত্রীদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা	৭৫-৮৬
	ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিশেষ করে ছাত্রীদের সচিত্র প্রতিবেদন	৮৭-৯৫
সপ্তম অধ্যায়		
	ভূমিকা	৯৬
	তথ্য বিশ্লেষণ	৯৬-৯৭
	সুপারিশমালা	৯৮-৯৯
	মূল্যায়ন	৯৯-১০০
	উপসংহার	১০০-১০১
পরিশিষ্ট-১		
	সাক্ষাৎকারে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা	১০২
পরিশিষ্ট-২		
	গ্রন্থপঞ্জি	১০৩-১০৫

Dhaka University Institutional Repository

সার-সংক্ষেপ

আন্দোলন ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত দিন। এই দিনে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঢাকার রাজপথকে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করে জীবন দিয়ে গেছে কয়েকজন তরুণ। ১৯৫২ সাল ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত সময় হলেও এর শুরু বা শেষ এখানেই নয়, এর সূত্রপাত ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানি রাষ্ট্র সৃষ্টির পরপরই। তৎকালীন পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষা-ভাষি বাঙালীদের পাশ কাটিয়ে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ধীরে ধীরে প্রতিবাদ চূড়ান্ত আন্দোলনে রূপ নেয়। পাকিস্তানের শাসক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ ও ২৪ মার্চ ঢাকায় দুটি সভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে বাঙালিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে এবং আন্দোলন দানা বাধে ঢাকাসহ সারা পূর্ব বাংলায়। এ সময় আন্দোলন বেগবান করতে গঠিত হয় "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ"। এ পরিষদে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন ও তমুদ্দিন মজলিসসহ ছাত্রীরা এবং আন্দোলনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষ। আমার গবেষণার প্রস্তাবিত শিরোনাম অনুযায়ী আমি ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের ভূমিকা তুলে ধরেছি। কিন্তু আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ এবং সর্বোপরি ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন সে সকল শহীদদের প্রতি আমি আমার পূর্ণ সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তথাপি একটা কথা বলতেই হয় ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী নারী বা ছাত্রী ব্যতীত অন্যান্যদের নিয়ে যতটা আলোচনা বা তাদের কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরা হয়েছে বা হয় ছাত্রীদের নিয়ে তদ্রুপ হয়নি বা হয়না। তাই আমি রক্ষণশীলতার যুগে অগ্রগামী ও সাহসী ছাত্রীদের কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাত্রী বা নারীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক এবং অনুসরণীয় ভূমিকা হিসেবে উপস্থাপন করেছি। যে ছাত্রীরা সকল বাধা, পর্দা, ভয়-ভীতি সমাজ-পরিবার সব কিছুকে তুচ্ছ করে দেশের স্বার্থে মৃত্যুকে সামনে রেখে ১৯৫২ সালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে এবং ১৯৫৬-তে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি দেয়ার সময় পর্যন্ত আন্দোলনে স্বীয় স্থানে ও কর্তব্যে অটল ছিল- আমি আমার গবেষণা কর্মের মাধ্যমে তাদের সঠিক চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার ভূমিকা, উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা এলাকা ও প্রয়োগ ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ছাত্রীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে অবশ্যই তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। গবেষণার সময়কাল ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ ধরা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে এবং সঠিক কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরতে আমি ঢাকা বিভাগকে বেছে নিয়েছি।

গবেষণাতে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যথাঃ ক) প্রাথমিক বা প্রথম পর্যায় (খ) মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় পর্যায় এবং (গ) তৃতীয় পর্যায়। প্রাথমিক পর্যায়ের উৎসের ক্ষেত্রে আমি ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রশ্নমালা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি। দ্বিতীয় পর্যায়ে-ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের নামের যে দলিল আছে আমি সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং তৃতীয় পর্যায়ে আমি বিভিন্ন বই ও পত্রিকার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে ভাষা তথা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বংলা ভাষার প্রশ্ন কি ভাবে এসেছে এবং ধীরে ধীরে কিভাবে তা আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে আমি সেই সময়ে ভাষা বা ভাষার সমস্যা নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্ব ও পরে গুণীজনদের আন্দোলনের ইঙ্গিত স্বরূপ বক্তব্য এবং পরিণতি এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত সূচনা সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

গবেষণার তৃতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ ১৯৪৭-১৯৫১ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা, কর্মকাণ্ড, মিছিলে পুরুষদের পাশাপাশি ছাত্রীদের এবং নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, স্মারকলিপিসহ ভাষা আন্দোলনের সচিত্র ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে (১৯৫২-১৯৫৬) ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত আন্দোলন এবং ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি এবং এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন কমিটি গঠন, সভা, মিছিল ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে পুরুষদের সঙ্গে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের বাস্তব ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করেছি।

গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে প্রশ্নমালার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যেসব ছাত্রীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি যারা এখনও জীবিত আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ে যারা অসুস্থ ও মৃত তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন বই ও দলিল থেকে তাদের কর্মকাণ্ডের বা অংশগ্রহণের ধারাবাহিক বর্ণনা তুলে ধরেছি।

সপ্তম অধ্যায়ে আমি গবেষণা কর্মটির প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, সুপারিশমালা এবং ফলাফলের ভিত্তিতে উপসংহার প্রণয়ন করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি অর্জনে যুগে যুগে শাসক শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে এদেশের মানুষ। এই সংগ্রাম বাংলাদেশের সৃষ্টির পূর্বে ও পরে বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষাপটে হয়েছে। বাংলাদেশের সংগ্রাম বা আন্দোলনের ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। নিঃসন্দেহে, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম সুসংসহ স্ফূরণ। কিছু কিছু ঘটনা বা কোনো দিন জাতির আত্মপরিচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে- আর সেইসব ঘটনা বা দিনকে বাঙালি জাতি স্মরণ করে শ্রদ্ধা ভরে। বাঙালি জাতির জন্য বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারি তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা দিন। ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে হলেও পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়। মূলত: এই আন্দোলন হতেই আমাদের দেশের মানুষের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

ভাষা আন্দোলন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের যৌক্তিক দাবি। বাংলা ভাষা কেবল পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তব জনগোষ্ঠীর ভাষা নয়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষাও ছিল। এ রকম পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছিল। তারা যদি বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি জানাত, তাহলে এ দাবিও অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক মনে হতো না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির কথা চিন্তা করেই বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবি জানায়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর এই দাবি নিঃসন্দেহে মাতৃভাষা, সংস্কৃতি ও ব্যবহারিক দিক থেকে অত্যন্ত যৌক্তিক ও সঙ্গতিপূর্ণ।

রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্ক রয়েছে বলেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবি জানায় এবং আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হাসনাত আব্দুল হাই তার ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে বলেছেন,-"ভাষা শুধু একটি গোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে বা উপায় নয় ভাষা একটি সংকেত বা সিম্বল যার মাধ্যমে একটি গোষ্ঠী তার পরিচিতি, ঐতিহ্য এবং অধিকারসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। ভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাতেও এসব লক্ষ্য অর্জন করা যায় কিন্তু সেই প্রতিনিধিত্বে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না এবং সম্পূর্ণতারও অভাব থাকে। এর ফলে রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের গৃহীত সিদ্ধান্তে যে ভাষাভাষী গোষ্ঠী ভিন্ন ভাষার ওপর নির্ভরশীল হয়ে মত আদান-প্রদান করে তার আইনগত ও নীতিগত অধিকার সংরক্ষিত নাও হতে পারে। রাষ্ট্রের পরিচালনায় একটি জনগোষ্ঠীকে যথার্থভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিতে হলে তার ভাষাকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রহণ করার বিকল্প নেই। বাংলা ভাষাকে যখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হবে না বলে ঘোষণা করা হয় তখন শুধু ভাষার প্রতি অমর্যাদা জ্ঞাপন করা হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্র পরিচালনায় গৌণ ভূমিকা পালন করতে দেয়া হবে, এমন ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছিল। ভাষার প্রতি স্বীকৃতি আর অখণ্ড জাতিসত্তার অঙ্গ হিসেবে একটি ভাষাভিত্তিক নৃতাত্ত্বিক অধিকার উপভোগ করতে দেয়ার সম্মতি প্রায় একই পর্যায়ের। একুশের ভাষা আন্দোলন তাই কেবল সাংস্কৃতিক ছিলনা, এর রাজনৈতিক চরিত্র সেই সময় সুস্পষ্ট হলেও ছিল গুরুত্বপূর্ণ।" (সূত্রঃ প্রথম আলো, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭)

বাঙালির সামাজিক; সাংস্কৃতিক এমনকি রাজনৈতিক মনোভাবনার কথা যদি বলা হয়, তবে অবধারিতভাবেই ভাষার প্রসঙ্গ এসে যায়। আপাতদৃষ্টিতে ভাষা যে কোন জাতির সাংস্কৃতিক গণ্ডিবদ্ধ হলেও বাঙালির ভাষা প্রশ্নে এটি শুধু সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নয়, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করে। কেননা বাঙালির ভাষা চেতনার সঙ্গে যুক্ত তার স্বাধিকারের চেতনা, তার রাজনৈতিক অধিকারের ইতিহাস। পৃথিবীতে ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতিসমূহের মধ্যে নিঃসন্দেহে বাঙালি অন্যতম জাতি। বাঙালিরাই প্রথম এবং একমাত্র জাতি যারা ভাষার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অধিকার ও নিজস্ব সত্ত্বা আদায়ে জীবন দিয়েছিল। একটি দেশের জাতীয় পতাকা, জাতীয় পোশাক, জাতীয় প্রতীক ইত্যাদি স্বাধীন দেশের পরিচয় বহন করে। তাই সব জাতীয় বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় যখন বাঙালির ভাষার প্রশ্ন আসে তখনই সমস্যা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পরও পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ থেকে উপেক্ষিত হয়। বস্তুত পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এসেছিল জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্বের মাধ্যমে ধর্মের ভিত্তিতে। ধর্মের যুক্তিতেই পাকিস্তানের দুটো অংশে (পূর্ব ও পশ্চিম) সাংস্কৃতিক অর্থাৎ ভাষাগত বিচ্ছিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এক রাষ্ট্র গঠিত হয়। কিন্তু এই ধর্মীয় ঐক্য দুটো অংশের কৃত্রিম এই বন্ধনে বেশিদিন আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে-এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই উভয় অংশের ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালির সংস্কৃতির চিন্তার তথ্যানুসন্ধান করতে গেলে অবশ্যম্ভাবীভাবে সংস্কৃতির যে উপাদানটি সামনে আসে তা হলো তার ভাষা। ভাষা হলো সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উপাদান। ভাষা শুধু কথাবার্তা ও আলাপের মাধ্যমে নয় বরং ভাষার সঙ্গে জড়িত থাকে সমগ্র জাতির অস্তিত্ব। মূলত মাতৃভাষার উৎকর্ষ ব্যতীত কোনও জাতিই আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ফলস্বরূপ ভাষাকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন তা সর্বতোরূপেই একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যদিও পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কখনোই রাজনৈতিক পরিচয়হীন ছিল না বরং এর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিচয় সব সময়ই ছিল সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা জোর দিয়ে বলা হলেও এর সঙ্গে যে বাঁধা ওতপ্রোতভাবে জড়িত সে বিষয়ে গভীরভাবে কেউই ভাবেন নি। এ জন্যই দেশ বিভাগের (১৯৪৭) পর বহু জটিল সমস্যার সঙ্গে ভাষার প্রশ্নটির উত্থাপিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের বিবেচনায় আপাত সমাধান হিসেবেই উর্দু ও বাংলা উভয় ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপিত হয়। এই দাবি অংনেকাশে সমর্থিতও হয়। তৎকালীন সময়ে "বেগম" পত্রিকাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেনি বরং এ দাবি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে মন্তব্য করে-

"তা যদি হয় তবে তা অস্বাভাবিক হবে না, কেননা পাশ্চাত্যে কয়েকটি রাষ্ট্রের একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হয়েছে। পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থায় এরূপ নিয়ম করতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলা একটি বাধ্যতামূলক শিক্ষণীয় ভাষা হবে। এতেই উভয় পাকের মধ্যে অন্তরের সংযোগ দৃঢ়তর হবে। সমগ্র পাকিস্তানে বাংলা বা উর্দু কোন ভাষাকেই এককভাবে রাষ্ট্রভাষা করা সমর্থন করা যায় না।" (তথ্যসূত্র ঃ বেগম পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৪৮)।

ভাষা আন্দোলনে রাজনৈতিক চরিত্র সুস্পষ্ট থাকলেও অর্থনৈতিক কারণও জড়িত ছিল। তাই ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব শুধু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নেও অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের সীমাহীন গুরুত্ব আমাদের জাতীয় জীবনে এক বিস্ময় স্বরূপ। ভাষা আন্দোলন আমাদের দিয়েছে চেতনা, উদ্দীপনা, জাতীয়তাবোধ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা, যার ফলশ্রুতিতে বাংলার মানুষ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন, ৭১-এর অসহযোগ আন্দোলন ও এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এনেছে স্বাধীনতা। পৃথিবীর বুকে অঙ্কিত হয়েছে বাংলাদেশের মানচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন। ভাষার দাবি নিঃসন্দেহে প্রাণের দাবি। তাই মাতৃভাষায় কথা বলা, স্বপ্ন দেখা এবং নিজ ভাষাকে ভালোবাসা মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এই মৌলিক অধিকারকে ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস চালানোর কারণেই এদেশের আপামর জনগোষ্ঠী আন্দোলন শুরু করে। আমরা তাই নিঃসন্দেহে একথা বলতে পারি, ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। ভাষা আন্দোলন শুধুমাত্র ভাষাভিত্তিক আন্দোলন নয়, এর প্রভাব, প্রয়াস ও প্রচেষ্টা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে আমাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নতুন স্বপ্নে জন্ম দেয়। আর এ কারণেই এ দেশের আপামর জনসাধারণ ভাষার ব্যাপারে কোন রকম আপোষ না করে নিজ মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে।

ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ছাত্রদের মধ্যে হলেও ছাত্রীরাও এতে অংশ গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের অবদান অনস্বীকার্য। ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি। পর্যায় দুটিকে- প্রথম পর্যায় (১৯৪৭-১৯৫১) এবং দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫২-১৯৫৬) নামে ভাগ করা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামে ছাত্রদের পাশপাশি ছাত্রীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষা আন্দোলন বা ভাষার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, স্মারকলিপি, প্রতিবেদনলিপি, মিছিল, সভা সমাবেশ, পিকেটিং, অর্থ সংগ্রহ, পোস্টার লিখন ছাড়াও আন্দোলনকারীদের গোপন ঘরোয়া বৈঠক, তাদেরকে আশ্রয়দানসহ সে সময়ের রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থায় যতদূর সম্ভব যে ভাবেই সাহায্য সহযোগিতা করা যায়-নারীরা তাই করেছেন।

ভাষা আন্দোলনের প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় পর্যায়েই নারী বা ছাত্রীরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম মুসলিম মহিলা বিষয়ক বেগম পত্রিকা ও আনন্দ বাজার পত্রিকা নারীদের প্রবন্ধ, স্মারকলিপি, প্রতিবেদনলিপি প্রকাশ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যেমন-

(১) প্রবন্ধ-বেগম পত্রিকা ঃ (ক) "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"-মুহসেনা ইসলাম- ৩০ অক্টোবর ১৯৪৮, (খ) "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা"- বেগম আফরুন্নেসা- ৬ ও ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৮, (গ) "ছাত্র আন্দোলন কি দোষণীয়?"- সালেহা বেগম রানী- ২৭ এপ্রিল ১৯৫২, (ঘ) "রাজনীতি ও নারী"- হামিদা আক্তার চৌধুরী- ৮ জুন ১৯৫২, (ঙ) "একুশে ফেব্রুয়ারি"- দিলারা সিদ্দিক- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

(২) স্মারকলিপি ঃ ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার ১১ জনেরও অধিক নারী তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন।

(৩) প্রতিবেদনলিপিঃ নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের মহিলা সাংগঠনিক সম্পাদিকা রুকিয়া আনোয়ারের প্রতিবেদনলিপি 'আনন্দবাজার' পত্রিকা প্রকাশ করে।

এছাড়াও ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চের মিছিলে অন্যান্য ছাত্রনেতাদের সঙ্গে নাদেরা বেগমও বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করেন। আবার এ বছরের শেষের দিকে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না' ইত্যাদি স্লোগানে যে মিছিল বের হয়, সে মিছিলে প্রায় চল্লিশ জন নারী অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে নাদেরা বেগম, আনোয়ারা খাতুন, কামরুন্নাহার লাইলী, সুফিয়া খান অন্যতম।

১৯৫২ সালের একুশ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সে সমস্ত সভা এবং স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদেরকে মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে যে দলগুলো বের হয়ে আসে, তাদের মধ্যে ছিলেন রওশন আরা বাচ্চু, হালিমা খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম অন্যতম।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের যে দলগুলো বের হয় তার মধ্যে পঞ্চম দলটি ছিল ছাত্রীদের। দশজন ছাত্রীর যে দলটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, তাদের মধ্যে ছিলেন- সুফিয়া ইব্রাহিম, সাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, হালিমা খাতুন প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীদের মধ্যে যারা ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন নাদেরা বেগম, আনোয়ারা খাতুন, রওশন আরা, শামসুন্নাহার আহসান, জুলেখা হক, ড. কাজী খালেদা খাতুন, সোফিয়া খান, সারা তৈফুর, কায়সার সিদ্দিকী, গুলে ফেরদৌস, ডঃ শরীফা খাতুন, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, মনোয়ারা ইসলাম, মোসলেমা খাতুন, জোবেদা খাতুন, হামিদা রহমান অন্যতম।

১৯৫৪ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরির পর কলা ভবনের আমতলায় সভা চলাকালীন পুলিশ অতর্কিত হামলা করে এবং পঁচিশ ছাত্রীকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে রওশন আরা চৌধুরী রেনু, তটিনী দাস, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, সানজিদা খাতুন অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনে নারী বা ছাত্রীদের এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় ইতিহাস রচনায় নারী ভাষা সৈনিকদের তথা ছাত্রীদের সে সব অবদানের কথা উপেক্ষা করা হয়েছে। পুরুষ ভাষা সৈনিকদের তথা ছাত্রদের নিয়ে যে ভাবে আলোচনা পর্যালোচনা গবেষণা করা হয়েছে ছাত্রীদের নিয়ে তদ্রুপ কোনো কাজ হয়নি।

ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে বদরুউদ্দীন উমরের "পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি" (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), এবং আতিউর রহমান ও অন্যান্যদের "ভাষা আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার" (১ম খণ্ড), "ভাষা আন্দোলনঃ অর্থনৈতিক পটভূমি" (২য় খন্ড), ভাষা আন্দোলন ঃ শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবনতা সমূহ" (৩য় খণ্ড), ভাষা আন্দোলন: অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান" (৪র্থ খণ্ড) ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস-আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক অন্যতম।

মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাঙালি জাতির এমন আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেই ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের ইউনেস্কো নামক সংস্থা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা" দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা ভাষার প্রতি এমন বিরল সম্মান শুধুমাত্র বাঙালি জাতির আত্মত্যাগের বিনিময়েই সম্ভব হয়েছে। তাই আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, ২১ ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোন পেক্ষাপটে এবং কেন আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আর এ কারণেই ২১ ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রায়োগিক ও ব্যবহারিক দিক নির্ণয় করে জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এই দিনটির তাৎপর্য ভূমিকা ও গুরুত্ব তুলে ধরার প্রয়াসে সচেষ্ট হতে হবে। আর তা বাস্তবায়নের জন্য সরকার, সচেতন মহল ও বুদ্ধিজীবীদের সহায়তা অত্যন্ত অগ্রগণ্য বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

বলার অপেক্ষা রাখে না, গবেষণা কর্ম একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগুতে থাকে। "ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের ভূমিকা"-আমার গবেষণার এই বিষয় থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে দেশের আপামর জনসাধারণের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকাও ছিল অগ্রগণ্য। তাই ভাষা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই। পুরুষ শাসিত সমাজে বসবাস করেও আমাদের দেশের নারীরা বিশেষ করে ছাত্রীরা মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং অত্যাচারের সম্মুখীন হয়ে নিজের আত্মমর্যাদা, বলিষ্ঠতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে- তা নিঃসন্দেহে আমাদেরকে অভিভূত ও বিস্মিত করে। ভাষা আন্দোলনের জন্য ছাত্রী সমাজ পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসেছে স্ফূলিঙ্গ এবং দৃপ্ততার সঙ্গে যা তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় আশা করা অবশ্যই দুলর্ভ। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের এমন দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ডের কথা আমাদের কাছে এখনও অস্পষ্ট। ছাত্রদের নিয়ে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হলেও ছাত্রীদের নিয়ে আজও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা করা হয়নি। কেন করা হয়নি তা আমরা জানিনা তবে উপলব্ধি করতে পারি। কারণ পুরুষ শাসিত সমাজের নাগপাশে এখনো আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি। নারী সমাজ অতীতে সর্বদাই নির্যাতিত হয়েছে এবং বর্তমানেও তাই হচ্ছে। নারী পুরুষের সমাধিকারের কথা বিবেচনা করে ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রীদেরকে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। আর এই প্রয়াসকে সামনে রেখেই আমি "ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের ভূমিকা" শিরোনামে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

গবেষণা কর্মটি কতগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে আরম্ভ করেছি। উদ্দেশ্যগুলো হলো-

- ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশ গ্রহণের অবস্থা বিশ্লেষণ করা,
- ছাত্রীদের তৎকালে সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান পর্যালোচনা করা।
- ছাত্রীদের প্রকৃত ও সঠিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরা।
- নাম না জানা আন্দোলনকারী ছাত্রীদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করা।
- গবেষণার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী নারী-পুরুষের অবদানের মধ্যে যে বৈষম্য আনা হয়েছে তা দূর করা।
- বিশ্বায়নের যুগে ছাত্রীদের অবদানকে বাস্তব প্রয়োগ উপযোগী করে উপস্থাপন করা, যাতে করে বর্তমান সময়ের ছাত্রীরাও উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

- কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার যুগে ছাত্রীদের সাহসী ভূমিকা উপস্থাপন করা, যাতে করে বর্তমান প্রজন্ম বিষয়টি জানতে পারে।
- ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষোভ ও বেদনার কথা তুলে ধরা।
- ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনকে কতটুকু উৎসাহিত করেছে তা বিশ্লেষণ করা।
- বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাত্রীদের সচেতন করে তোলা।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে সমগ্র নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কেন আমি ছাত্রী এবং ঢাকা বিভাগকে বেছে নিলাম। এর স্বপক্ষে আমার যুক্তি হলো সে সময়ে সমস্ত আন্দোলনেরই মূলে ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য এবং আন্দোলনের সূচনা ছিল ঢাকা কেন্দ্রিক, যদিও আমি অন্যান্য এলাকার আন্দোলনকে ছোট করে দেখছি না। ভাষা আন্দোলনে যে সমস্ত পুরুষ অংশ গ্রহণ করেছে- তাদের মহান আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেই তাদেরকে "ভাষা সৈনিক খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয় আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করেছি- নারীদের জন্য আজও সে রকম কোনো খেতাবের প্রচলন করা হয়নি। তাই জাতির কাছে, জাতির বিবেকের কাছে এবং দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের কাছে আমার প্রত্যাশা ও আকুল আবেদন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের সে রকম খেতাবে ভূষিত করা হোক। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ছাত্রীরা বাংলা ভাষার জন্য যে বিরল সম্মান বয়ে নিয়ে এসেছে তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও মর্যাদাবহ। তাদেরকে সামান্য সম্মান প্রদর্শন ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার জন্যই জাতির বিবেকের কাছে আমার এই যৌক্তিক দাবি।

শহীদদের অমর কীর্তি যুগে যুগে বাংলাদেশের মানুষের অন্তরে চির জাগরুক হয়ে থাকবে। যুগে যুগে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে এনে দেবে নতুন উদ্দীপনা ও প্রেরণা। শুধুই স্মৃতির রোমন্থন নয়, তাই খুঁজে বের করেছি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের সঙ্গে একই সুরে সুর মিলিয়েছে যে নারী বা নারীরা, যাদের নাম আজ বিলীন প্রায়। ১৯৪৮ সালের পর থেকে বাংলা ভাষার ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার যে ক্ষীণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তা শাসকচক্রের অশুভ তৎপরতার ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফলে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ছাত্রদের মধ্যে হলেও ছাত্রীরা পিছিয়ে থাকেনি। এমনকি সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ এই আন্দোলনের সমর্থনে দাড়ায়। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে জাতিসত্তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ-সাহসী ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের নিমেত্তে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বেরিয়ে আসে এবং অংশগ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল বিভিন্ন বয়সী মহিলা, মহিলা সমিতি ও নারী সংগঠন ইত্যাদির তুলনায় অনেক বেশি। তুলে ধরেছি সুফিয়া আহমেদ, শামসুন্নাহার মাহমুদ, হালিমা খাতুন, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা, নাদেরা বেগম ও হামিদা রহমানসহ আরও নাম না জানা নারী সৈনিকদের কর্মকাণ্ডের কথা।

আমাদের জাতীয় জীবনে আন্দোলনের প্রতিক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলন তথা একুশ দিয়েছে সাহস, শক্তি ও অনুপ্রেরণা। আর এদেশের নারীদের সোচ্চার ও উজ্জীবিত হওয়ার সময়ও গণনা করা হয় এই সময় থেকে। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছাত্রীরা পরবর্তী সময়ে সকল ক্ষেত্রে নারীদের যে কোনো বিষয়ে অনুসরণের পথিকৃত হয়ে কাজ করেছে। তাই ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পর "সুবর্ণ জয়ন্তীতে" দাড়িয়ে তাদের তথা ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রী সৈনিকদের মুছে যাওয়া নাম খুঁজে বের করেছি এবং তাদের প্রকৃত কর্মকাণ্ড তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাদেব মহিমান্বিত চেতনা আন্দোলিত করবে ক্ষীণ জাগ্রত নারী চেতনাকে, সোচ্চার করবে অবদমিত নারী কণ্ঠকে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহস সঞ্চয় করতে সাহায্য করবে। তাহলেই অমর একুশের শানিত কাস্তেটা দিয়ে জীবনের সফল ফসল সকলের ঘরে তুলতে পারবো।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক। কিন্তু আজ আন্দোলনের প্রায় ৫৫ বছর পর সাক্ষাৎকারের জন্য খুব কমসংখ্যক মহিয়সীর খোজ পেয়েছি। তাই গবেষণার জন্য আমাকে ভাষা সৈনিকদের নামের দলিল, তাদের উপর লেখা বিভিন্ন বই, ইতিহাস ও পত্রিকার সাহায্য নিতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রাথমিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি অনেক পরোক্ষ তথ্যও ব্যবহৃত হয়েছে।

মূলত তিন ধরনের উৎস থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করেছি। যথা-

ক) **প্রাথমিক পর্যায়ের উৎস ঃ** এক্ষেত্রে আমি প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপ পদ্ধতিতে ভাষা আন্দোলনে যারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন তাদের কাছ থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

খ) **মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস ঃ** ভাষা আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের নামের যে দলিল আছে আমি গবেষণার জন্য সেখান থেকে সাহায্য নিয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

গ) **তৃতীয় পর্যায়ের উৎস ঃ** এক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার জন্য বিভিন্ন বই ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি।

গবেষণা এলাকা ঃ

ভাষা আন্দোলনে যারা অংশ নিয়েছেন তারা এদেশেরই সন্তান। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় জেগেছিল এদেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ এবং এদেশের বিভিন্ন এলাকায় আন্দোলনের জোয়ার বয়ে যায়। তবে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকা এবং ঢাকার আশে পাশে বিভিন্ন এলাকা ও স্কুল-কলেজকে ঘিরে। যেহেতু আমি একজন ছাত্রী সেহেতু গবেষণার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সুবিধার্থে এবং সময় ও অর্থের কথা চিন্তা করে ঢাকা বিভাগকে বেছে নিয়েছি।

সীমাবদ্ধতা ঃ

ভাষা আন্দোলন যেহেতু প্রায় ৫৫ বছর আগে হয়েছে সেহেতু প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের তুলনায় মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রতি বেশি নির্ভর করতে হয়েছে। তাই মাধ্যমিক ও তৃতীয় পর্যায়ের উৎস হতে তথ্য সংগ্রহের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। ভাষা আন্দোলনের এত বছর পর কতিপয় ছাত্রীর খোজ পেয়েছি। তাই তাদের সঠিক চিত্রটি তুলে আনতে আমাকে অনেক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এসব সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সাক্ষাৎকারদানকারীদের স্মৃতি বিভ্রম লক্ষ্য করেছি। তাই এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় আমি সত্য ঘটনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। তথাপি আমার গবেষণা কর্মে কিছু কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। তবে গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে আমি আমার নিজের দিক থেকে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণা ছিলাম এবং কাজটি বিশ্বাসযোগ্যভাবে শেষ করেছি। যেহেতু চাকুরিজীবী নই এবং আমি একজন শিক্ষার্থী বিধায় আমার আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে।

প্রয়োগ ক্ষেত্র ঃ

যুগান্তকারী ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছে এদেশের বহু ছাত্র-ছাত্রী। কেউ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন, আবার কেউ চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে। এ যাবৎকালে ভাষা আন্দোলন নিয়ে যে স্মারক, প্রবন্ধ এবং যত লেখালেখি হয়েছে তার বেশির ভাগেরও বেশি হয়েছে পুরুষ ভাষা সৈনিকদের নিয়ে। ছাত্রীদের নিয়ে বা তাদের ভূমিকা নিয়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি বললেই চলে। তাই আমি

Dhaka University Institutional Repository

রক্ষণশীলতার যুগে পিছিয়ে না থাকা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বৃহদাংশ ছাত্রীদের নিয়ে গবেষণা কাজ বেছে নিয়েছি। আমি মনে করি এ গবেষণা কর্মটি নারী উন্নয়নের চেতনাকে নতুন করে উম্মোচিত করবে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে এর গুরুত্ব বাড়বে। যে সব ক্ষেত্রে এ গবেষণা কর্মটি প্রয়োগ করা যাবে তা নিম্নরূপ ঃ

১) ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাত্রীরা সচেতন হবে।

২) ছাত্রীরা দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবে।

৩) ছাত্রীরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে।

৪) ছাত্রীরা সকল প্রকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

৫) ছাত্রীরা দেশের স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হবে।

৬) ছাত্রীদের দেশের উন্নয়ন কাজে অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

৭) ছাত্রীদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

৮) ছাত্রীরা নারী জাগরণমূলক বিভিন্ন পরিকল্পনা, সভা, মনিটরিং, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন হবে।

৯) গবেষণা কর্মটি দেশের ইতিহাসকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবে।

১০) গবেষণা কর্মটি ছাত্রী ও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে উপকৃত করবে।

১১) গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও লিঙ্গের বৈষম্যের মতাদর্শ পরিবর্তনে সম্ভব হবে।

১২) গবেষণা কর্মটির দ্বারা বৈষম্যমূলক অবস্থার মধ্যে থেকেও কিভাবে নারী তথা ছাত্রীরা রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখতে পারে তা স্পষ্ট হবে।

১৩) এই গবেষণাটির দ্বারা ছাত্রীরা নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনে সক্রিয় হবে এবং নিজেদের শক্তিকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তা জানতে পারবে।

১৪) গবেষণা কর্মটি হতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটবে এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে।

১৫) গবেষণা কর্মটি তৃণমূল পর্যায় থেকে ছাত্রীদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গঠন করতে সাহায্য করবে।

১৬) গবেষণা কর্মটি হতে ছাত্রীরা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সমর্থ হবে।

১৭) অধিক মাত্রায় জনকল্যাণ কাজে উৎসাহ লাভ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

"যে বহ্নিশিখার আলোয় আমরা পাড়ি দিয়ে এসেছি অনেক পথ, পুষ্পিত হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের জাতীয়তাবোধ, সে বহ্নিশিখা হয়েছে আরও দীপ্ততর ও প্রসারিত, প্রান্তর থেকে দিগন্তে। স্মারক হয়ে আজও আছে আকাশে অনন্য ভোরের রক্তিম নবারুন "অমর একুশে"। একটি স্বাধীন জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশে দুর্বার আকাঙ্খায় দীপ্ত বায়ান্নোর একুশের শাশ্বত জাতি আজ এক নতুন তাৎপর্যের পটভূমি স্মরণ করে। ভাষা আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা, স্বতন্ত্র জীবন ধারায় সর্বপ্রকার প্রভাব এবং আধিপত্যের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। এই দিবসের তাৎপর্য বাংলাদেশি জাতির জীবনে নিরবধি কাল প্রবাহমান থাকবে, তাতে সন্দেহ নাই। মাতৃভাষাকে স্ব-মহিমায় উজ্জীবিত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দিতে না পারা আমাদের ব্যর্থতা। তাই আমার মনে হয় আমার এ গবেষণার দ্বারা নতুন করে উন্মোচিত হবে ভাষা আন্দোলনের ছাত্রী সৈনিকদের বা মহীয়সীদের স্মৃতি কথা, বেদনার কথা, সুখের কথা, চেতনার কথা, সর্বোপরি বাংলার কথা আমরা যারা বাংলাদেশের জাতিসত্তায় বিশ্বাস করি, বাংলায় কথা বলি। সবশেষে বলতে চাই, "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি।"

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঃ

বাংলা ভাষার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ব্যাপ্তি শিখরস্পর্শী। আর বাংলা ভাষা তাই অভূতপূর্ব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে অর্জন করেছে বিরল স্বীকৃতি। এখন সারা বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক পঁচিশ থেকে ত্রিশ কোটির মতো। দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা রাজ্য, আসামের বরাক উপত্যকা বা কাছাড় ও করিমগঞ্জ, গোয়ালপাড়া এবং বিহার উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যে ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বাংলা ভাষাভাষীদের বসবাস রয়েছে। তবে উপমহাদেশের বাইরেও যেমন-গ্রেট বৃটেন ও উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন নগরীতে বাংলা ভাষাভাষীদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। সারা বিশ্ব ব্যাপী বাংলা ভাষার এমন বিস্তৃতি ও চর্চা নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতি তথা বাংলাদেশি মানুষের জন্য এক গৌরবময় ব্যাপার। শুধু তাই নয়, একুশ শতকে ভাষাভাষীর সংখ্যানুযায়ী বাংলা ভাষার স্থান বিশ্বে চতুর্থ। আমাদের জাতীয় জীবনে এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না।

একুশ শতকে বাংলা ভাষার যে বিকাশ ও চর্চার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছে, তা শুধু সম্ভব হয়েছে ১৯৪৭-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্য, যার প্রভাবে ১৯৬১ সালে ভারতের অসম রাজ্যের শিলচরে বাংলা ভাষা আন্দোলন হয়েছে, ১৯৭২ সালে করিমগঞ্জে, ১৯৮৬ সালে অসমের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বাংলা ভাষা আন্দোলন হয়েছে, নারীসহ প্রায় চৌদ্দজন জীবন উৎসর্গ করেছেন। উপমহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাংলা ভাষার জন্য "১৯৫২ থেকে ১৯৮৬" সালের মধ্যে অন্তত বাইশজন প্রাণ দিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং ভারতের একাধিক রাজ্যেও সরকারি ভাষা। আবার পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কাছাড়, করিমগঞ্জ ছাড়াও ইউরোপ-আমেরিকার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বাংলা ভাষার বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আর এভাবেই বাংলা ভাষার অস্তিত্ব, অধিকার ও ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত হতে পেরেছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পূর্বে বাংলা ভাষা কখনো দরবারি, সরকারি বা রাজভাষা হতে পারেনি। কিন্তু বাংলা ভাষার চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই শুরু হয়। বৌদ্ধ সিদ্ধার্থ বা সহজিয়ারা বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' রচনা করেন। কিন্তু পাল রাজাদের সময় বর্তমান বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল সম্ভবত শাসিত হয়েছে প্রাকৃত বা অপভ্রংশ ভাষায়, সেন রাজাদের সময় সংস্কৃত ভাষায়, পাঠান ও মোগল আমলে ফার্সি ভাষায়, মুসলমান শাসনামলে তুর্কি ভাষায়, ইংরেজ শাসনামলে অবিভক্ত বাংলা ও আসাম শাসিত হয়েছে ইংরেজি ভাষায় এবং পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষকে শাসন ও বঞ্চিত করার প্রয়াস নিয়েই বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে উর্দু ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহার শুরু করে। কিন্তু পূর্ব বাংলার সচেতন সমাজ পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর এমন আশা আকাঙ্ক্ষাকে সফল হতে দেয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অবস্থান যে ভৌগোলিক সীমানায় সে অঞ্চলের মানুষ বহুকাল ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতি ও শক্তির কাছে এ অঞ্চলের মানুষ শাসিত হয়েছে। বহিরাগত শাসক গোষ্ঠীর বহিরাগত ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে বাংলা ভাষা তথা স্বদেশী ভাষা বিকাশ লাভের সুযোগ পায়নি। আবার ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের কারণে উপমহাদেশে স্বাধীন দুটি রাষ্ট্র জন্ম নিলেও দেশীয় ভাষা তথা বাংলা ভাষার বিকাশ ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের সুযোগ এলেও বাংলা ভাষা তার অধিকার লাভ থেকে বঞ্চিত হতে থাকে।

দেশ বিভাগের পূর্বে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ে জাতিগত দিক থেকে এমন কি সংস্কৃতি ও ভাষার ক্ষেত্রেও ছিল ভিন্ন। বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় ভাষার ভিন্নতা। কিন্তু অবিভক্ত ভারতে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ১৯২১ সালের সরকারি আদম শুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল এ রকম–

ভাষার নাম	ভাষা ব্যবহারকারীদের সংখ্যা (আনুমানিক)
বাংলা	২৩, ৯৯৫, ০০০
উর্দু-হিন্দি	২০, ৭৯১, ০০০
পাঞ্জাবি	৭, ৭০০, ০০০
সিন্ধি	২, ৯১২, ০০০
কাশ্মীরি	১, ৫০০, ০০০
পুশতু	১, ৪৬০, ০০০
গুজরাটি	১, ৪০০, ০০০
তামিল	১, ২৫০, ০০০
মালয়ালাম	১, ১০৭, ০০০
তেলেগু	৭৫০, ০০০
উড়িয়া	৪০০, ০০০
বালুচি	২, ২৪, ০০০
ব্রাহুই	১, ২২, ০০০
আরবি	৪২, ০০০
ফার্সি	২২, ০০০
অন্যান্য	৫, ০৬০, ০০০

তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন - রফিকুল ইসলাম)

১৯২১ সালের সরকারি আদম শুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী বলা যায় অবিভক্ত ভারতে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকদের মধ্যে সেই ভাষাতাত্ত্বিক বোধ বা জ্ঞান ছিল না-যা আমাদের জন্য চরম সত্য।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪০-১৯৪৬ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক বিবাদ, উত্তাপ-উত্তেজনা এবং বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, তেতাল্লিশের মন্বন্তর প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে নানাবিধ দুর্যোগ, দুর্ভোগ মানুষের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। এরকম ভয়াবহ প্রেক্ষাপট মানুষের সুস্থ, স্বাভাবিক ও সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি কেড়ে নেয়। আবার এ সময় দেশ বিভাগের মতো রাজনৈতিক প্রক্রিয়াও শুরু হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমানদের বিচ্ছেদ হবে এমন কথা স্মরণ করেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন,–

" বাংলাদেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। ---- সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য । এইখানে আমাদের জাতিভেদের কোনো ভাবনা নেই।" **(তথ্যসূত্রঃ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য-আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক)**

বাংলা ভাষার গুরুত্ব এবং সেক্ষেত্রে বাংলার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষা চাপিয়ে দেয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার ছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তা উল্লেখ করেছেন একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে–

" বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বইয়েরও অধিকসংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। ভাষাটাকে কোণঠাসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দু চাপানো হয় তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখান কাটিয়া দেয়ার মতো হইবে না কি? চীন দেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে কেহ বলে না যে চীনা ভাষা ত্যাগ না করিলে মুসলমানির খর্বতা ঘটিবে।" (তথ্যসূত্র ঃ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য-আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক)।

আসলে বাংলা-উর্দুকে ঘিরে মুসলমানদের ভাষা সমস্যার বিষয়টি বিতর্কিত ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে সময় একদল আধা-বাঙালি, উর্দুভাষী বাঙালি ও রক্ষণশীল চিন্তার বাঙালি মুসলমান উর্দুকে মাতৃভাষা রূপে গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা শুরু করে। অবশ্য সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অন্যান্য অঙ্গনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালি মুসলমান তখন থেকেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে লড়াই করতে থাকেন, যদিও সেই লড়াই সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গনেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪০ সালে ৩১ মার্চ কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান পরিষদের উদ্যোগে মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে ইকবাল দিবস পালিত হয়। এই দিবসে সভাপতির বক্তৃতায় আব্দুর রহমান সিদ্দিকী বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দান সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। তার বক্তব্যে উপস্থিত ছাত্র জনতার মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তাকে সভাকক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

পরিত্যাগ করতে হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতাকে শান্ত করতে সমিতির সম্পাদক হাবিবুল্লাহ বাহারকে বলতে হয়–

"বঙ্গভাষা আজ বিশ্বে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বঙ্গভাষাই বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা (করতালি ও আনন্দধ্বনি)। --- সভায় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে না বলা এবং বাংলা ভাষাকে অপমান করা একই কথা। আমরা উর্দুকে শ্রদ্ধা করিব, কিন্তু মাতৃভাষার ওপরে তাহাকে স্থান দিতে পারিব না।" (তথ্যসূত্রঃ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য - আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক)

কিন্তু পরবর্তীতে মন্ত্রিত্বের টানে হাবিবুল্লাহ বাহার বাংলার পক্ষে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি বরং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। এই সভায় বাংলার পক্ষে মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসিন সাহিত্যরত্ন বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন,–

"বাঙালি আরবী, উর্দু, ইংরেজী যে ভাষাতেই পাণ্ডিত্য লাভ করুন না কেন, তাহারা চিরদিন স্বপ্ন দেখিবেন বাংলায়। মাতৃভাষাই মানুষের প্রাণের ভাষা।" (তথ্যসূত্রঃ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য- আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক)।

প্রথম বাঙালি ঔপন্যাসিক নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী বাংলা ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বলেন,– "পুরষানুক্রমে বাংলাদেশের গণ্ডীর মধ্যে বাস করে আর বাঙ্গালা ভাষাতে মনের ভাব ব্যক্ত করেও যদি বাঙালি না হয়ে আমরা অপর কোনো একটা জাতি সেজে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে আমাদেরতো আর কোন উত্থান নাই-ই, অধিকন্তু চিরতমসাচ্ছন্ন গহ্বর মধ্যে পতন অবশ্যম্ভাবী।" (তথ্যসূত্রঃ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য- আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক)।

উর্দু-বাংলা ভাষার এমন বিতর্কিত ব্যাপার নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলার পক্ষে লেখা লিখেছেন। প্রখ্যাত রাজনীতিক কমরেড মোজাফফর আহমেদ বাংলা ভাষার পক্ষ নিয়ে উল্লেখ করেছেন–

"যখন উর্দু ভাষা জন্মগ্রহণ পর্যন্ত করে নাই, তখনো বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা ছিল। ---- বাংলাদেশে আমরা উর্দুকে কখনো প্রশ্রয় দিতে পারি না । " (পূর্ব বাংলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন

Dhaka University Institutional Repository

যদিও তখন বাংলাদেশের জন্ম হয়নি) (তথ্যসূত্র ঃ আমাদের মাতৃভাষা- চেতনা ও ভাষা আন্দোলন- মুস্তাফা নূরউল ইসলাম)

আবার বাংলা ভাষা সম্পর্কে সৈয়দ এমদাদ আলী উল্লেখ করেন-

"কেহ উর্দুর স্বপ্নে বিভোর হইলেও বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাঙালা এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈথ থাকা উচিত নহে।"(তথ্যসূত্রঃ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য- আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক)।

বাংলা ভাষার পক্ষে মতামত প্রদানে 'নূর' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়–

"বাঙ্গালার মাটি হইতে উর্দুকে নির্বাসিত করিতে না পারিলে বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না । মাতৃভাষার বিপুল ও তুমুল চর্চা ব্যতীত কোনও জাতির মুক্তি ও কল্যাণ লাভ কদাপি সম্ভবপর নহে।" (তথ্যসূত্রঃ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য- আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক)।

১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর বাংলা ছাড়া ভারতের অপর কোনো প্রদেশে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ বা সরকার গঠন করতে পারেনি। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে শুধুমাত্র অবিভক্ত বাংলা প্রদেশেই নির্ভেজাল মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়। কিন্তু পাকিস্তান গণপরিষদেই সেই বাংলার মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহারের দাবি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখাত হয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি, পাকিস্তান গণপরিষদের আইনবিধি সংক্রান্ত কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে (২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি ও ২ মার্চ ১৯৪৮) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধির উনত্রিশ নং উপ-ধারা সংশোধন প্রয়াসে 'ইংরেজি' ভাষার সঙ্গে 'উর্দু' ভাষার নাম যুক্ত করার সরকারি প্রস্তাবে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী উত্থাপনের বিষয়টি। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত নিম্নোক্তভাবে সংশোধনীটি উত্থাপন করেন–

"That in sub-rule 29, after the word "English" in line, the words," or Bengali be inserted." (তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন - রফিকুল ইসলাম)।

Dhaka University Institutional Repository

আবার ঐ সংশোধনীর সমর্থনী ভাষণে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটিও উত্থাপন করেন। তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তির অবতারণা করেন– যা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেক্ষাপটে ছিল খুবই জরুরি একটা বিষয়। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবটি প্রবল সরকারি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান স্বয়ং এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন। আসলে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণেই পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (১৫ আগস্ট ১৯৪৭) পূর্বেই ১৯৪৬ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে, সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা থেকে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির মুখের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। আর এভাবেই পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে থাকে খুব জোরালোভাবেই।

সর্বোপরি আমরা তাই বলতে পারি, বাঙালি মুসলমানের ঘরে উর্দুকে প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র যেমন পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে, তেমনি আমাদের ভাষার প্রশ্নটি ভাষা আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই এদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তথা সচেতন মানুষ (যারা বাংলা ভাষার জন্য নিবেদিত প্রাণ) বাংলা ভাষার ঐতিহ্য, মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার সংগ্রামে মেতে ওঠেন। তাঁদের এ সংগ্রাম চলেছে রক্ষণশীল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে– আর ১৯৪৭- ১৯৫৬ পর্যন্ত সেই ভাষা আন্দোলন চলেছে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। তাই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, ভাষা আন্দোলন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়-এই আন্দোলনের সূত্রপাত মূল আন্দোলনের কয়েক দশক আগ থেকেই শুরু হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় (১৯৪৭-৫১)

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক ভারতীয় উপমহাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়েই বৃটিশ সরকারের প্রায় ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়। যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান। আবার ১৯৪৭-১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক, সাস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়েই সূচিত হয় আমাদের জীবনের হার না মানা আন্দোলনের জোয়ার। হ্যা, আমি এই সময়ের ভাষা আন্দোলনকেই হার না মানা আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করছি। ভাষা আন্দোলন বলতে আমরা ১৯৪৭-১৯৫৬ সালের মধ্যে সংঘটিত রক্তপাত আন্দোলনকেই বুঝে থাকি। যদিও ভাষার প্রশ্নে আন্দোলন, ক্ষোভ, প্রতিবাদ, অসন্তোষ দেশ বিভাগের কয়েক দশক আগে থেকেই শুরু হয়।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আজাদ পত্রিকায় বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। ১০ জুলাই কমুনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শীর্ষক একটি পত্রে সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। পত্রটি লেখেন হামিদা সেলিম (রহমান)। তিনি পরবর্তী সময়ে ১৯৪৮ এর মার্চ মাসে যশোর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। পত্রটি নিম্নরূপ ঃ

"বাঙ্গালি হিসাবে যেমন আমরা সমগ্র বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের ভেতর দাবি করেছিলাম, তেমনি আজ বাংলাদেশের ভাষা হিসেবেও বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করবো না কেন? পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় 'আজাদের' পৃষ্ঠায় রাষ্ট্রভাষা বাংলা ভাষাকে পরিণত করার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখে খুবই দুঃখ হয়। আমাদের বাঙালির এতদিনের সাহিত্যকলা সবই কি আজ ভুলে যেতে হবে? কেমন করে আমরা ভুলে যাব মাননীয় আকবাম খার লেখা কোরানের তরজমা, কেমন করে আমরা ভুলে যাব তার রচিত মোস্তফা চরিত, কেমন করে আমি ভুলে যাব নজরুলের গান। এই সাহিত্য কি আবার উর্দুতে তরজমা হবে। শ্রদ্ধেয় আকরাম খাঁ কি আবার তার কলম উর্দুর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করবেন? পাকিস্তান জনগণের রাষ্ট্র তাই তার ভাষা হবে জনগণের ভাষা। বাংলার সাড়ে চার কোটি লোক যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করে, যে ভাষায় কথা বলে, যে ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে সে ভাষা তাদের নিজস্ব ভাষা হবে না এও কি বিশ্বাস করতে হবে? স্বাধীন পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার

Dhaka University Institutional Repository

সাথে তাদের প্রাণের কোন যোগ থাকবে না এও কি সত্য হবে?" (তথ্যসূত্র ঃ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড-বদরুদ্দীন ওমর)।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পর রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক ড. কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা" নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন-

"বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু মুসলমানের ওপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা করা হয় তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশি দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব পশ্চিমের সম্পর্কের অবসান হওয়ার আশঙ্কা আছে।" (তথ্যসূত্রঃ আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন-মুস্তফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত)

তমুদ্দিন মজলিস সর্বপ্রথম কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপন করে। তমুদ্দিন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাশেম বাংলা ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ১ সেপ্টেম্বর তমুদ্দিন মজলিসের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবের দাবি উত্থাপন করা হয়।

১) বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা, পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি উর্দু ও বাংলা।

৩) বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাবিভাগের প্রধান ভাষা, উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃ প্রাদেশিক ভাষা ইংরেজি হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা।

৪) শাসনকার্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাতত কয়েক বছরের জন্য ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।

তমুদ্দিন মজলিসের এই সমস্ত গঠনমূলক প্রস্তাব পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাষানীতির অন্যতম ভিত্তি হতে পারত। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী তা গ্রহণ করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭ সালের ১ নভেম্বর তমুদ্দিন মজলিসের উদ্যোগে রশিদ বিল্ডিং-এ যে ভাষা আন্দোলনের অফিস স্থাপন করা হয়। বাংলা ভাষা প্রশ্নে এ সময় ছাত্র, বুদ্ধিজীবী মহলের সাথে সাথে নারীরাও সচেতনভাবে এগিয়ে আসে। ভাষা আন্দোলনের একজন অন্যতম কর্মী লিলি খান রাষ্ট্রভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সব সময় উক্ত অফিসে যাতায়াত শুরু করেন। (সূত্রঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, কৃত-বশির আল হেলাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-২২০)।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন মাস পরেই পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু পাকিস্তানের গৃহীত এ প্রস্তাবে পূর্ব বাংলায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম প্রতিবাদ সভা। এই প্রতিবাদ সভায় বামপন্থী ছাত্রনেতা মুনির চৌধুরী বক্তৃতা করেন এবং ডাকসুর তদানীন্তন সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ প্রস্তাব পাঠ করেন। তারা দুজনেই কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ছিলেন। আর এভাবেই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাড়ে চার মাসের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকদের উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে আমতলার সভায় প্রথম ও প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। সভা শেষে ছাত্রদের একটি মিছিল পূর্ব বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বাসভবন বর্ধমান হাউস এবং মুসলিম লীগের মুখপাত্র ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আর বাংলা ভাষার দাবিতে এটাই ছিল প্রথম সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে শেষদিকে তমুদ্দিন মজলিসের উদ্যোগে 'প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। আর তমুদ্দিন মজলিসের নূরুল হক ভূঁইয়াকে এই কমিটির আহবায়ক মনোনীত করা হয়। কিন্তু এই সংগ্রাম কমিটি ভাষা আন্দোলনের কার্যক্রম তুলে ধরতে তেমন সমর্থ হয়নি।

১৯৪৮ সাল থেকে আমাদের প্রাণের ভাষা ও মায়ের ভাষার প্রশ্নটি অত্যন্ত ধারালো গতিতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ২২ ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব বঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার মহিলারা তৎকালীন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। স্মারকলিপিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যমকে বাংলা করার পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতের আনন্দ বাজার

Dhaka University Institutional Repository

পত্রিকা এই স্মারকলিপিটি "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি-পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর নিকট শ্রীহট্টের মহিলাদের স্মারকলিপি"- এই শিরোনামে প্রকাশিত করে। স্মারকলিপিটি হলো-

"পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করতে দাবি জানিয়ে শ্রীহট্ট জেলার মহিলাগণের পক্ষ হতে পূর্ববঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন- মিসেস জোবোদ খাতুন চৌধুরী- প্রেসিডেন্ট শ্রীহট্ট জেলা মহিলা মুসলিম লীগ, মিসেস সৈয়দা শাহেরা বানু চৌধুরী- ভাইস প্রেসিডেন্ট, মিসেস সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন- সেক্রেটারী, জেলা নারী লীগ- রোকেয়া বেগম, শামসী কাইসার, রশিদ-এম এ বিটি, মিসেস নূরজাহান বেগম, মিসেস সুফিয়া খাতুন, মিসেস মাহমুদা খাতুন, মিসেস শামুসুন্নেসা খাতুন ইত্যাদি। (তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮)।

এছাড়াও নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের মহিলা সাংগঠনিক সম্পাদিকা রুকিয়া আনোয়ারের একটি প্রতিবেদনলিপি থেকে নারীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের দৃশ্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ভাষা আন্দোলনে রুকিয়া আনোয়ারের সমর্থনসহ প্রতিবেদনটি পত্রিকায় প্রকাশ কর হয় এভাবে-

"নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদিকা রুকিয়া আনোয়ার একটি বিবৃতি প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ ব্যথিত হয়েছে। পাকিস্তানে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৬১ জন বাংলা ভাষাভাষী এবং সাড়ে চার কোটি লোকের মাতৃভাষা।----- আমি পূর্ববঙ্গের মহিলাদের বিশেষত ছাত্রীদের নিকট বাংলা সংগ্রাম চালাবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।" (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ৫ মার্চ ১৯৪৮)।

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গটি পাকিস্তান গণপরিষদে প্রথম উত্থাপন করেন কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সংসদীয় দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত- যা আমি ২য় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করছি।

প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি, ভাষা আন্দোলনের কার্যক্রমকে ভালোভাবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়। এই সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা, ফরিদ আহমদ, শামসুল আলম, আবুল খায়ের, অলি আহাদ, শওকত আলী, আজিজ আহমদ, আব্দুল মতিন খান চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, আবুল ওয়াহেদ চৌধুরী ও ছাত্র যুবনেতা নঈমুদ্দিন আহমদ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনকে গতি দেয়ার জন্য ১৯৪৮ সালে ২ মার্চে তমুদ্দিন মজলিস পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের যুক্তরাষ্ট্রভাষা সাব-কমিটি' নামে 'দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদের নতুন আহবায়ক করা হয় ছাত্রনেতা শামসুল আলমকে। আর নারী নেত্রী আনোয়ারা খাতুন উক্ত সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। বাংলা ভাষার প্রশ্নে গণপরিষদ ও মুসলিম লীগ নেতাদের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টির জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অন্যান্য কর্মসূচী পালনের আহবান জানানো হয়। দ্বিতীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ৪ মার্চ ও ৫ মার্চ তারিখে ১১ মার্চের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য পরিষদে বৈঠক বসে। ফজলুল হক হলে ১০ মার্চ রাতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ১১ মার্চের কর্মসূচি ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলা ভাষার দাবিতে ক্লাস বর্জন সভা-সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা, বিবৃতি প্রচার ও ইশতেহার বিলি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে ওঠে। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে ৬ মার্চ অনুষ্ঠিত ছাত্র সভায় 'ইনসাফ' 'ফরিয়াদ' পত্রিকা এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে পুলিশি বর্বর হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয় এবং তার সঙ্গে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চে সাধারণ ধর্মঘট পালনের জন্য দেশের জনসাধারণ, যুব ও ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানানো হয়।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দিন। এদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালিত হয়। আবার আবদুল গণি রোডে অর্থাৎ সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেটের সামনে সামসুল, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ এবং দ্বিতীয় গেটের সামনে কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী প্রমুখ নেতা অবরোধ কর্মসূচির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাকে, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, রমনা পোস্ট অফিস ইত্যাদি কেন্দ্রেও অবরোধের কর্মসূচি নেয়া হয়। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের একটি অংশ অলি আহাদ প্রমুখ নেতার সঙ্গে আবদুল গণি রোডে বিক্ষোভে অংশ নেন, অন্য অংশ ছিল পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাক অঞ্চলে। আর এভাবেই ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য এবং ছাত্রনেতাদের সমন্বয়ে শুরু হয় বাংলা ভাষার জন্য প্রত্যক্ষ ও জোরালো সংগ্রাম।

১১ মার্চের বিক্ষোভ দমনের জন্য পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ ও ব্যাপক ধড়পাকড় করতে থাকে। ফলে বহু ছাত্র ও ছাত্রনেতা গ্রেফতার ও আহত হন। গ্রেফতারকৃত ছাত্র নেতাদের মধ্যে ছিলেন সামসুল

Dhaka University Institutional Repository

হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলি, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহবায়ক নঈমুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের প্রতিবাদ সভায় পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও পূর্ব বাংলার মন্ত্রিদের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা এবং পাকিস্তান গণপরিষদের পূর্ব বাংলার সদস্যদের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানানো হয়। আবার সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে ছাত্রদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বহু সরকারি কর্মচারি অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ১১ মার্চের সরকারি দমনীতির বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালের ১৩ মার্চ "দৈনিক আজাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন,- "এই সব ঘটনার প্রতিবাদে পরিষদের সকল সদস্যের প্রতিবাদ করা উচিত, আমি সর্বসাধারনে ঘোষণা করিতেছি যে, ঢাকার নিরীহ ও নির্দোষ ছাত্রদের ওপর পুলিশ আক্রমণের প্রতিবাদে আমিই প্রথম পদত্যাগ করিব।" (তথ্য সূত্র ঃ ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-রফিকুল ইসলাম)।

কিন্তু শেরে বাংলার ঐ আহবানে তেমন কেউ সাড়া দেয়নি। কারণ পরিষদের বেশির ভাগ মানুষই ছিল মুসলিম লীগ দলীয়। আর তখনো সরকারি বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল, যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠেনি।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে উর্দু ও বাংলা নিয়ে যে বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছিল তাতে বাংলার পক্ষ সমর্থন করে 'বেগম' পত্রিকায় মোহসেনা ইসলাম "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন-

"পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ শিক্ষিতের হার আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের ভেতর অধিকাংশই অল্প বা অর্ধশিক্ষিত। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের যে কোন দোষ-ত্রুটি, অভাব-অভিযোগ জানাতে হলে এমন একটি সাধারণ ভাষার প্রয়োজন যা দ্বারা দেশের জনগণ অনায়াসেই রাষ্ট্রের সম্মুখে তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পারে এবং তারাও তা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাই তাদের কাছে সাধারণ ভাষা উর্দু কথা তো আসতেই পারে না।" (তথ্যসূত্র ঃ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-মোহসেনা ইসলাম, বেগম পত্রিকা-১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা-৩০ অক্টোবর ১৯৪৮)।

১৯৪৮ সালের ১১ থেকে ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বা প্রথম মুসলিম সরকার বিরোধী সংগ্রাম শুরু ঢাকার রাজপথে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ও কর্মিদের নিয়ে পুনর্গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বেই এই আন্দোলন চরম আকার ধারনা করে। ছাত্রনেতাদের সহায়তায় ও আন্দোলন ঢাকার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ মার্চে ছাত্রনেতারা একটানা ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। এদিকে ১৫

Dhaka University Institutional Repository

মার্চ পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতাদের সঙ্গে আট দফা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে বাধ্য হয়। কামরুদ্দিন আহমদ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আট দফা চুক্তি পত্রের খসড়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছাত্রনেতাদেরকে দেখিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়ে আসেন। এই চুক্তিপত্রে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিন আহমদ এবং সরকারের পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দিন স্বাক্ষর করেন। চুক্তিপত্রের শর্তগুলো এরূপ ছিল-

১। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।

২। পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩। ১৯৪৮ এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্য যে দিন নির্ধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারি ভাষা রূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা দ্বারা শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল কলেজ গুলোতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫। আন্দোলনে যাহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের ওপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ব বাংলায় যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সহিত আলোচনার পর আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হই নাই। (তথ্য সূত্র ঃ বাংলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন- রফিকুল ইসলাম)

Dhaka University Institutional Repository

ঐ চুক্তি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দী ছাত্র নেতাদের ১৫ মার্চ রাতেই মুক্তি দেয়া হয় কিন্তু আন্দোলন, বিক্ষোভ ১৬ মার্চেও অব্যাহত থাকে। আট দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার চারদিন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাত মাস পর অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা সফরে আসেন। তার এ সফর ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ২১ মার্চে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে বক্তৃতাদান কালে, ২৪ মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তন সভায় এবং ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে ঘোষণা করেন, "উর্দুই, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" তার রেসকোর্স ময়দানের দীর্ঘ বক্তৃতার মূল বিষয়ই ছিল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দান। রাষ্ট্রভাষা বাংলা বিরুদ্ধে এবং উর্দুর স্বপক্ষে কথাগুলো তিনি খুব জোরের সঙ্গে এবং স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। তার এ বক্তৃতা শুনে জনতার একাংশে সম্ভবত: ছাত্র জনতার একাংশে খুব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ কার্জন হলের সমাবর্তন সভায় বক্তৃতাদানকালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আবার উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার কথা উল্লেখ করেন। তার এ বক্তব্য শুনে উপস্থিত ছাত্ররা আর নিশ্চুপ বসে থাকতে পারেনি। তারা 'নো' 'নো' বলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এমতাবস্থায় মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে স্বল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত শান্তভাবে বক্তব্য সমাপ্ত করেন। এরপর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতারা জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে স্বারক প্রদান করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আবুল কাশেম, তাজউদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অলি আহাদ, কারুদ্দিন আহমদ, নাঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম এবং ডাকসুর ভিপি অরবিন্দ গুহ এবং ডাকসুর জিএস গোলাম আজম। কিন্তু জিন্নাহ যথারীতি বাংলা ভাষার দাবি নাকচ করে দেন। তদুপরি তিনি বিদায়ের প্রাক্কালে প্রদত্ত বেতার ভাষণে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করেন। বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার এমন ঘোষণা বহুসংখ্যক গণতন্ত্রমনা এবং রাজনৈতিক মধ্যপন্থী মানুষকে খুব আহত করে কিন্তু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার মতো তাদের সাহস অনেকেরই সেই সময় ছিল না।

পাকিস্তানের গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণার পর পূর্ব বাংলায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আট দফা চুক্তি কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়ে। আর

Dhaka University Institutional Repository

এই সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই চুক্তি বরখেলাপ করে ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল পূর্ব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত দুটি প্রস্তাবে বাংলাকে নির্ভেজাল প্রাদেশিক ভাষারূপে গণ্য করার সুপারিশ করা হয়।

কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ইসলামি আদর্শের দোহাই দিয়ে ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে প্রচলিত সমস্ত ভাষার জন্য আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান।

কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সমাধান এতো সহজ নয়, সমগ্র পাকিস্তানে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এগুলোর মধ্যে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাবই সর্বপ্রধান। অতিশীঘ্রই এ প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে তৎকালে 'বেগম' পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য করা হয় এভাবে-

"আমাদের শিক্ষাবিভাগ বহুদিন পর প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে মুষিক প্রসব করেছেন। মুসলিম শিশুরা তাদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবে আরবি হরফ শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, আজকের কোন দেশেই এ ধরনের উদ্ভট পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে যে, মাতৃভাষা বাদ দিয়ে বিদেশী ভাষার হরফের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। রাতারাতি যারা পূর্ব বাংলার শ্যামল প্রান্তরের স্থানে মরু আরবের খেজুর বীথির হিল্লোল নিয়ে আসতে চায়, তাদের কল্পনা শক্তির উর্বরতা নিয়ে দ্বিমত নেই কিন্তু তাদের বাস্তব অসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি যে হাসি ও সমবেদনার খোরাক জোগায় এটা তারা কি করে ভুলে যাচ্ছেন। জাতির ও সমাজের মূল বুনিয়াদের আগায় এভাবে কুড়াল মারতে দেশবাসী কখনো দিবে না।" (তথ্যসূত্র ঃ বেগম পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৯৪৮)

১৯৪৯ সালের ১১ মার্চের আন্দোলন দিবস পালনে তমুদ্দিন মজলিস বা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ কেউ কোনো উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেনি। এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ পালনের উদ্দেশ্যে ছাত্র ফেডারেশন নাদেরা বেগম, তকিউল্লাহ, নাসির আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। তারা একটি ছোটোখাটো মিছিল নিয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না।' ইত্যাদি স্লোগানের মধ্য দিয়ে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের দাবি আরো বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত করেন। কিন্তু এই মিছিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, যার পুরোভাগে প্রায় চল্লিশ জন মেয়ে ছিল। (সূত্র ঃ ছাত্র আন্দোলনের স্মৃতি- নাদেরা বেগম- ভোরের

Dhaka University Institutional Repository

কাগজ, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ।) পুলিশ মিছিল পরিচালনাকারী কয়েকজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে কিন্তু জামিনে তারা মুক্তি পায়। গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মধ্যে সৈয়দ আফজাল হোসেন, মৃণালকান্তি বাড়ৈ, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, ইকবাল আনসারী খান (হেনরী) ও আবদুস সামাদ অন্যতম।

আসলে ১৯৪৮ থেকে ১৯৪৯ সাল ভাষার প্রশ্ন ঘিরে দ্বিতীয় বার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। একদিকে উর্দু সমর্থক শাসক গোষ্ঠীর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার বিভিন্ন ধরনের তাত্ত্বিক বক্তব্য, অন্যদিকে বাংলাকে রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার যৌক্তিক দাবি উল্লেখ করে বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী একাংশের প্রতিবাদী উচ্চারণ প্রভৃতির সমন্বয়ে ভাষা বিষয়ক পরিবেশ যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী করাচিতে এক পাঠাগার উদ্বোধনকালে বলেন, "একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" বাঙালি আমলা মীজানুর রহমান তার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নামক প্রবন্ধে বলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" আবার জনৈক আবদুল বারী মাসিক মোহাম্মদীতে উল্লেখ করেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।"

উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ সম্পর্কে এ রকম মতবাদ এবং উর্দুবাদীদের নানা রকম কর্মকাণ্ড ও পদ্ধতির সমন্বয়েই বাংলা বিরোধিতার কাজ এগিয়ে চলে। অন্যদিকে বাংলাভাষাকে এমন চক্রান্ত ও বিরোধিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সচেতন ছাত্র-ছাত্রী ও বিভিন্ন মহল ও বাংলাপন্থীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চে গঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি কমিটি ১৯৫০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পেশকৃত রিপোর্টে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে। এরই প্রতিক্রিয়ার জের ধরে ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবিধান সম্পর্কিত জাতীয় মহাসম্মেলনে পাল্টা প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করা হয়। একই প্রশ্নে ১৯৫১ সালের ১৬ মার্চ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত অধ্যাপক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "বাংলা ভাষা অবহেলিত হইলে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্রোহ করিব"। (তথ্যসূত্রঃ "ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য"- আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক)। আর এসব প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করেই পূর্ব বাংলায় ১৯৫১ সালের ১১ মার্চে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হয়। আর এসব কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ব বাংলার আপামর জনসাধারণ ভাষার প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে শুরু করে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫২-১৯৫৬)

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৫২ সাল থেকেই। আর পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন এর মূল হোতা। আসলে খাজা নাজিমউদ্দিনের কারণেই ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে নতুন বিতর্কের শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা ভাষায় রুদ্ধ করার পরিকল্পিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এ ব্যবস্থা সমূহের দ্বারা বাংলা ভাষার উন্নতি তো ব্যাহত হবেই উপরন্তু বাঙালির ভাত কাপড়ের প্রশ্ন এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লো। তাদের একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই বাঙালিরা বা বাংলা ভাষাভাষীরা সরকারি কাজকর্মসহ অফিস আদালত এমনকি সাহিত্যও অচল হয়ে পড়বে এমন আশা আশংকাই প্রতীয়মান হয় ফলে বাঙালি অনিবার্যভাবে অবতীর্ণ হয় রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলনে। এ আন্দোলন তীব্রতা পায় যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র নির্ধারিত হওয়ার পূর্বেই ঘোষণা দেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ফলে তার এই বক্তৃতায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং দৈনিক 'আজাদ' সহ অন্যান্য সংবাদপত্রগুলো তৎপর হয়ে ওঠে।

তৎকালে এ প্রসঙ্গে 'বেগম' পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে উল্লেখিত হয় -

"আমরা যতদূর জানি শাসনতন্ত্র রচনার কাজ এখনো চলছে। পাকিস্তান শাসন পদ্ধতি, ভাষা প্রভৃতি কি হবে তা জনমত দ্বারাই স্থির হবে। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে পূর্বেই কোন কিছু বলা বা জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেয়া শুধু অসম্ভব নয় অগণতান্ত্রিকও বটে। পাঁচ কোটি মানুষের মুখের ভাষাকে বদলাবার যে কোন যুক্তি থাক, কারো অধিকার নেই তা বদলাবার। মাতৃভাষা ছাড়া কোন জাতির বাঁচা বা উন্নতি সম্ভব নয় এবং এই জীবন মরণ প্রশ্ন সম্পর্কে জাতি নীরবও থাকতে পারে না।" (তথ্যসূত্র ঃ বেগম পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৫২)।

ছাত্র সমাজও তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ শুরু করে। ফলে ২৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩০ জানুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতীক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই আহ্বানে ছাত্রসমাজ ব্যাপকভাবে সাড়া দেয় এবং এই সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হরতালের কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খাজা নাজিমউদ্দিনের ভাষা সম্পর্কিত ভাষণের (১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি) জন্যই 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' নতুন ভাবে জেগে ওঠে। আর ভাষা বিতর্কের নতুন উত্তাপকে কেন্দ্র করেই ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে এক সর্বদলীয় কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। আর এ সভায় "সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করা হয়। এ পরিষদের আহবায়ক মনোনীত হন কাজী গোলাম মাহবুব। আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মিসভায় তমুদ্দিন মজলিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান লেবার ফেডারেশন, ইসলামী ভাতৃসংঘ, পূর্ব পাকিস্তান রিক্শা শ্রমিক ইউনিয়ন, সিভিল লিবার্টি, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ববঙ্গ কর্মি শিবির, পূর্ব পাকিস্তান মোহাজের অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল সংসদ, আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সভায় আবুল হাশিম, অলি আহাদ, খালেক নেওয়াজ খান, হামিদুল হক চৌধুরী, শামসুল হক, খায়রুল বাশার, আবদুল মতিন, মাহবুবা খাতুন বক্তৃতা করেন। এই সভায় খাজা নাজিমউদ্দিনের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা।" পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী উর্দু অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।" (তথ্যসূত্র ঃ ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য -আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক)। (আর এই সভায় প্রস্তাবিত ৪ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচিকে সমর্থন জানানো হয়)।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভ মিছিলে ঢাকা শহর মুখরিত হতে থাকে। বিশেষ করে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনের রাস্তা স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'আরবি হরফে বাংলা লেখা চলবে না'-এই ছিল মিছিলের মূল স্লোগান । এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি সারা পূর্ববঙ্গে সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' সফল করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। ১৯৫২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সঙ্গে 'পতাকা দিবস' পালিত হয় এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি নুরুল আমিন সরকার একমাত্র সরকারি বিরোধী ইংরেজী 'দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার ' পত্রিকা নিষিদ্ধ করে।

কিন্তু নুরুল আমিন সরকার প্রস্তাবিত ২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিকে নস্যাৎ করার জন্য ২০ ফেব্রুয়ারির অপরাহ্নে এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, মিটিং,

Dhaka University Institutional Repository

মিছিল, বিক্ষোভ প্রভৃতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে ছাত্র সামাজ ও সচেতন মহলে ১৪৪ ধারা জারি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের অস্তিত্বের সঙ্গে ভাষার প্রশ্নটি জড়িত ছিল বলেই তারা সব সময় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের এ রকম উত্তেজিত মনোভাবের কারণেই ১৪৪ ধারা জারির বিষয়টি নিয়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতারা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। ফলে ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে মাওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতির কারণে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে ৯৪, নওয়াবপুর রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে এক জরুরি বৈঠক বসে। ১৪৪ ধারা অমান্য করে ২১ ফেব্রয়ারির কর্মসূচি পালন করা হবে কিনা এই বিষয়টিই ছিল বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রশ্নে মতানৈক্য দেখা দেয়। বিভিন্ন সংগঠনের উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে অলি আহাদ, আবদুল মতিন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র গোলাম মওলা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ভোট দেন, আর বাকি ১১ জন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিপক্ষে ভোট দেন। কিন্তু মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। ফলে বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিষয়টি নিয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি পালনকে নস্যাৎ করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় তা নিয়ে বিভিন্ন মতানৈক্য থাকলেও কতিপয় ছাত্র, ছাত্রনেতা, যুবলীগ নেতা ও কর্মি মিলে ২০ ফেব্রয়ারি রাতেই সিদ্ধান্ত নেয় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার, পাকিস্তান সরকারের ১৯৫২ সালে ২০ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারির পরপরই ছাত্র সমাজ এই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পেছনে ছাত্র সমাজের অবস্থান ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাদের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, যুবলীগ, মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ কলেজ এবং কয়েকটি হলের ছাত্র কর্মিরা ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি পালনে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয় এবং রৌদ্র ওঠার পরপরই বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের ছাত্র-ছাত্রীরা গত রাতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনসহ ছাত্র-ছাত্রী সমাগমের ভিড় আমতলার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে বিরাজ করছিল উত্তেজিত আলোচনা ও তর্কবিতর্ক।

Dhaka University Institutional Repository

আর বাইরের রাস্তায় খাকি হাফপ্যান্ট পরা পুলিশ অবস্থান নেয় লাঠি ও অস্ত্রসহ। আবার রাস্তায় পুলিশের জিপ ও পিকআপ ট্রাকও অবস্থান নিয়েছিল।

বেলা এগারটার দিকে আমতলায় সভা শুরু হয় এবং এ সভায় সভাপতিত্ব করেন গাজিউল হক। এ সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত (১৪৪ ধারা না ভাঙ্গা) জানানোর জন্য বক্তব্য রাখতে আসেন শামসুল হক। মধুর ক্যান্টিণ পাশে দাঁড়ানো কিছু সংগ্রামী ছাত্রনেতা এ সময় শামসুল হকের মতামতের প্রতি সমর্থন করেন। এদের মধ্যে কাজী গোলাম মাহবুব, হেদায়েত হোসেন চৌধুরী, নেওয়াজ খান, এস. এম নুরুল আলমসহ আরো অনেকেই ছিলেন। শামসুল হকের এরকম বক্তব্য চাপা পড়ে যায় কিছু সংখ্যক উত্তেজিত ছাত্রের প্রতিবাদে। ফলে সে সময় তার বক্তৃতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

আমতলার সভায় শামসুল হকের পর বিশ্ববিদ্যলয় সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক আবদুল মতিন বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠেই উচ্চারণ করেন "আজ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা না হলে ভাষা আন্দোলন তো বটেই, ভবিষ্যতে কোনো আন্দোলনেই ১৪৪ ধারার ভয়ে এগিয়ে নেয়া যাবে না। দীর্ঘপথ পার হয়ে আন্দোলন বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, এখন পিছিয়ে আসার কোন উপায় নেই।" তিনি সমবেত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, "আমরা কি তাহলে ১৪৪ ধারার ভয়ে পিছিয়ে যাবো?" তার এ বক্তব্যে সমবেত ছাত্র সমাজ উত্তেজিত হয়ে 'না', 'না' ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকে। উপস্থিত আরো অনেক নেতাই ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য জোরালো বক্তব্য প্রদান করনে।

আমতলার সভায় অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় দশজন পুরুষ এবং চারজন করে মহিলারা ছোট ছোট মিছিল করে ১৪৪ ধারা অমান্য করবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মিছিল বের করা হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রুপে গ্রুপে মিছিল বের হয়ে যাবে এমন পরিস্থিতি তখন ছিল না। কে কার আগে মিছিলে যাবে, তখন সেটাই ছিল প্রধান ব্যাপার। আর একক্ভাবে মিছিলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক নেতৃস্থানীয় ছাত্রনেতা গ্রেফতারও হয়েছেন। এদের মধ্যে আবদুস সামাদ, আলী আজমল, আনোয়ারুল হক খান প্রমুখ অন্যতম। আর মেয়েদের মধ্যে মিছিলে ছিলেন শাফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, রওশান আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহিম, নার্গিস বেগম ও আরো অনেকেই।

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন প্রক্রিয়া একবার শুরু হলে তা থামানো অসাধ্য ব্যাপার। আর ভয়ভীতিও তখন মন থকে চলে যায়। আন্দোলনে একসঙ্গে অনেক ছাত্র রাস্তায় নেমে পড়ার কারণেই পুলিশের পক্ষে তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে ট্রাকে তোলা সম্ভব ছিল না। আর আন্দোলনের এই উত্তাল স্রোতকে থামানোর জন্যই পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এ সময় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'চলো চলো এসেম্বলি চলো' বলে উত্তেজিত ছাত্র-ছাত্রী স্লোগান দিতে থাকে। ফলে পুলিশ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। এদিন পূর্ববঙ্গ বিধান সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। আর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান চেষ্টাই ছিল পরিষদ ভবনের সামনে সংঘবদ্ধ হওয়া। পুলিশি বাঁধা ও আক্রমণে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আন্দোলনের তৎপরতা যতই বাড়তে থাকে ততই পুলিশ মিছিল ও আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য করে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও গুলি ছুঁড়তে থাকে। পুলিশের গুলিতে শহীদ হন বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে। রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকা জমাট বাঁধা রক্ত যেন লাল টকটকে সূর্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে।

২২ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত হলের ছাত্র-ছাত্রীরা ভাষা শহীদদের জন্য কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজ পরিধান করেন। এদিন সকাল ১০ টায় শেরে বাংলা এ . কে ফজলুল হকের উপস্থিতিতে মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে একুশের শহীদদের উদ্দেশ্যে বিশাল গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় ও ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রাতেও পুলিশের দল নির্মমভাবে লাঠিচার্জ ও গুলি চালায়। ফলে অসংখ্য শোভাযাত্রাকারী হতাহত হয়।

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারিতে নিহত শহীদদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য মেডিকেল হোস্টেলের সামনে (যেখানে শহীদদের রক্ত পড়েছিল) ২৩ ফেব্রুয়ারিতে রাতারাতি মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১০ ফুট উঁচু একটি স্মৃতিস্তম্ব নির্মার্ণ করেন। ২৪, ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারটি বাঙালির তীর্থকেন্দ্র হয়ে ওঠেছিল। কিন্তু নুরুল আমীন সরকারের পক্ষে তা অসহনীয় হয়ে পড়ে। ২৬ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী প্রথম শহীদ স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙ্গে দেয় এবং ট্রাকে করে শহীদ মিনারটির ইট, বালু, সিমেন্ট সব উঠিয়ে নিয়ে যায়।

২৪ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা আলাদা আলাদা সভায় মিলিত হয়ে গুলি বর্ষণের নিন্দা এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষকদের সভায় বক্তৃতা করেছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ।

১৯৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারিতেও ঢাকায় পালিত হয় পূর্ণ হরতাল। এদিন পুলিশ জননিরাপত্তা আইনে পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের সদস্য আবদুল রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, মনোরঞ্জন ধর এবং গোবিন্দলাল ব্যানার্জি যারা পরিষদে গুলি চালনা ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁদের এবং অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের শেষ সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে গ্রেফতার করে।

এছাড়া ২৬ ফেব্রুয়ারিতে সলিমুল্লাহ হলে নিরাপত্তা বাহিনী হানা দিয়ে ৩০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তাছাড়া এদিন ভোরে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, পি সি চক্রবর্তী, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ এবং বরিশালের রাজনৈতিক নেতা সতীন সেনকে গ্রেফতার করে আর ২৬ ফেব্রুয়ারিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।
২৯ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের মর্গান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণের সময় চাষাঢ়াতে জনতা পুলিশকে বাঁধা প্রদান করে। মমতাজ বেগম ছিলেন ভাষা আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মি। জনতা ও পুলিশের সংঘর্ষে এখানে প্রায় ৪৫ জন আহত হয় এবং ওসমান আলী এম এল এ সহ বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

পাকিস্তান গণপরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে মিসেস আনোয়ারা খাতুনও ভাষার প্রশ্নটি চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করার দাবি জানান। মিসেস আনোয়ারা খাতুন গণপরিষদের অধিবেশনে সমস্ত গ্রেফতারকৃত বন্দীদের বিনা শর্তে মুক্তি, আহত ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ীদের বিচার, সরকারের দমননীতি বন্দের দাবি জানান। মিসেস আনোয়ারা খাতুন গণপরিষদে মেয়েদের ওপর পুলিশি জুলুম ও হামলা সম্পর্কে বলেন, "ঘটনা দেখে মনে হয় আজও আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পাই নাই, তার প্রমাণ এই পুলিশি জুলুম। এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায় নাই-ছেলেদের কথা আর নাই বললাম- যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানে না সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। এ অত্যাচারের বর্ণনা দেয়া সম্ভবপর নয়- দু' একটি কথায় কিছুটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব-মিলিটারী মেয়েদের গাড়িতে করে কুর্মিটোলা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। যে মিনিস্ট্রি আমলে এই সমস্ত অত্যাচার হয়

Dhaka University Institutional Repository

যারা মাতৃজাতির সম্মান দেয় না, তাঁদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা উদ্ভেড হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে দু'জনের নাম দিচ্ছি। একজন হল ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ইব্রাহিম সাহেবের মেয়ে সুফিয়া ইব্রাহিম, আর একজন হল মিস রওশন আরা, থার্ড ইয়ার, বি. এ। মেয়েদের টোটাল উদ্ভেড-এর সংখ্যা হল ৮ জন। মন্ত্রিসভা এমন একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন যাতে নাকি মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে।" (তথ্যসূত্র ঃ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন-রফিকুল ইসলাম)।

১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে মিছিলে সমাবেশে অবিস্মরণীয় প্রথম শহীদ দিবস পালিত হয়। আতাউর রহমান খান সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে দিনটিকে 'শহীদ দিবস' হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানান। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইডেন কলেজ ও কামরুন্নাহার স্কুলে শহীদ দিবস পালনের জন্য ব্যাপক ও বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। শহীদ দিবস উপলক্ষে এবারই প্রথম প্রভাতফেরি অনুষ্ঠিত হয়। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে আজিমপুর গোরস্থানে সূর্যহীন ভোরে খালিপায়ে শহীদদের কবর জিয়ারত ও ফুল দেয়ার রেওয়াজ শুরু হয়।

১৯৫৩ সালে প্রথম 'শহীদ দিবস' পালিত হচ্ছে কিন্তু শহীদ মিনার নেই। এই শূণ্যতাকে পূরণ করার জন্য মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা মিলে বিলুপ্ত স্মৃতিস্তম্ভের স্থানটিতে কালো কাপড় ও লাল কাগজ দিয়ে হুবহু আগের স্মৃতিস্তম্ভের মতো প্রতিকী শহীদ তৈরি করেন। কার্জন হলে প্রাঙ্গণে তেমনি একটি প্রতীকী শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। ইডেন কলেজের ছাত্রীরা এবং ঢাকা কলেজের ছাত্ররা শহীদ স্মৃতিস্মম্ভ তৈরি করতে দিয়ে বাঁধার সম্মুখীন হলে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন,-

"ইডেন কলেজের ছাত্রীরা এবং ঢাকা কলেজের ছাত্ররা মিলে ঠিক করলো যে, তারা কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার গড়বে। ইডেন কলেজের ছাত্রীদের মধ্যে সৈয়দা হালিমা রহমান, সুফিয়া আসেফা, কানিজ ফাতেমা, রোজিয়া, লায়লা, সেলিমা ও সাদেকা এবং ঢাকা কলেজের ছাত্র ইকবাল আনসারী খান, আতিকুল ইসলাম, এনাম আহমেদ চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার তৈরি হতে থাকে। সেখানে ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস ফাজিলাতুননেসা, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম এবং উর্দুর অধ্যাপক আহসান আহমদ আসক গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বাঁধা দেন।" (তথ্যসূত্রঃ বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন - রফিকুল ইসলাম)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তথা শহীদ দিবস লক্ষ্য অর্জনের কাজকে ত্বরান্বিত করে। আর চুয়ান্নর নির্বাচনেই যুক্তফন্টের বিপুল নির্বাচনী বিজয় এবং মুসলিম লীগের অভাবনীয় ভরাডুবি ঘটে।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের পর পাকিস্তান সরকার উর্দু ও বাংলাকে পাকিস্তানের অফিসিয়াল লাংগুয়েজ বা সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করে। এর মধ্যে দিয়ে শাসক গোষ্ঠীর বাঙালির ভাষা সংক্রান্ত দাবি মেনে নেয়া হয়েছে এরূপ মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করে। কিন্তু রাষ্ট্রভাষার দাবি আর সরকারি ভাষা দুটো যে একই বিষয় নয় বরং শাসকচক্রের একধরনের কূটকৌশলমাত্র। অচিরেই 'বেগম' পত্রিকা তা ব্যাখ্যা করে শুভংকরের ফাঁকি ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো এভাবে-

"প্রথমেই লক্ষ্য করা দরকার, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে নয়, সরকারি ভাষা রূপে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই সরকারি ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা এক কথা নয়। শাসনযন্ত্র বা Administration এর সুবিধার্থে শাসক শ্রেণী এ ধরনের ভাষা গ্রহণ করে থাকেন। ইংরেজ আমলে শাসনযন্ত্রের সুবিধার জন্যই ফার্সিকে সরকারি ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সরকারি ভাষা পরিবর্তন করা চলে এবং তারা তা করেছিলেনও। কিন্তু একবার কোন ভাষাকে শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করলে তাকে পরিবর্তন করা সহজ নয়। দ্বিতীয়তঃ ২০ বছরের জন্য ইংরেজিকে চালু রাখার সিদ্ধান্ত। এ সিদ্ধান্ত দ্বারা মূলত ভাষার প্রশ্নে বিলম্বিত নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দীর্ঘ সময় নিয়ে জনগণকে ভাষার দাবি থেকে সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে মাত্র। তৃতীয়তঃ সিন্ধি ও আরবি ভাষাকেও রাষ্ট্র ভাষা করা সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ সম্পর্কে অন্য কোন কথা না বলে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের ভাষার মর্যাদা লাভের দাবিকে আমরা অসম্মান করি না। কিন্তু তা যখন বাংলা ভাষার দাবিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তখন দেশপ্রেমিক মাত্রই ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেন না।" (তথ্যসূত্রঃ বেগম পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১৯৫৪)।

শহীদ দিবস ঐ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনায় আরো উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালের পর শহীদ দিবসকে উপলক্ষ্য করে মিছিল আরো বড় হয় এবং সংখ্যায় ক্রমশ বাড়তে থাকে। ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ১৯৫৩ সালের পরও ছাত্র-ছাত্রীদের সংগ্রামী মিছিল অব্যাহত থাকে। ফলে প্রতি বছর অনেক ছাত্র-ছাত্রী গ্রেফতার হয়। বিশেষ করে ১৯৫৫ সালে শুধু ছাত্রদের নেতৃত্বে একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবস উদযাপনে মিছিল বের হলে কামরুন্নাহার লাইলী, হজরত আরা, ফিরোজা

Dhaka University Institutional Repository

বেগম, ফরিদা বারী ও দু'জন মেডিকেল কলেজের ছাত্রীসহ অনেকে গ্রেফতার হয়ে সেন্ট্রাল জেলে যান।

১৯৫৬ সালেও একুশে ফেব্রুয়ারিতে 'শহীদ দিবস' পালনে প্রতিবাদী চরিত্র অক্ষুণ্ন থাকে। এ বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে সরকারিভাবে শহীদ মিনারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার এবং শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম। এবার শহীদ দিবসেও ছাত্র-ছাত্রীদের মিলিত প্রয়াসে কাকডাকা ভোরে প্রভাতফেরি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তরের সামনে ফুল দিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, তারপরে আজিমপুরে শহীদদের কবরে ফুল প্রদান করে সম্মান জানানোর পরে ঘরে ফেরা। আবছা ভোরে ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে শহরের অনেকেই কণ্ঠ মিলিয়ে প্রভাতফেরি উদযাপনকে সার্থক করে তুলেছেন।

অবশেষে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ফলে অনেক ত্যাগ-তিতীক্ষা ও প্রাণের বিসর্জনে স্বীকৃতি পায় ২১ ফেব্রুয়ারির বিরল সম্মান। ভাষার জন্য শহীদ হওয়ার এমন দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর দরবারেও ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসলে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের পরই সূচিত হয় ভাষা আন্দোলনের অন্য এক বিজয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের সরাসরি সাক্ষাৎকার

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার-১

রওশন আরা বাচ্চু

প্রশ্ন ১ ঃ ১৯৫২-তে আপনার বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ আনুমানিক ২৪ বছর।

প্রশ্ন ২ ঃ ১৯৫২ সালে আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী ছিলাম।

প্রশ্ন ৩ ঃ বর্তমানে আপনার পেশা কি?

উত্তর ঃ টিচার্স ট্রেনিং কলেজসহ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছি। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন ও সমাজ সেবায় নিয়োজিত আছি।

প্রশ্ন ৪ ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার প্রথম অনুভূতি কি রকম ছিল?

উত্তর ঃ আমি প্রথম থেকেই এ আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। কারণ আমি একজন শিক্ষিত মানুষ হিসাবে অর্থাৎ যেহেতু আমি তখন ছাত্রী ছিলাম তাই স্বাভাবিকভাবেই ভাষার প্রশ্নটি আমাকে গভীর ভাবে আন্দোলিত করে। যদিও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম থেকে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারিনি। কারণ আমার বয়স তখন কম ছিল বা ঐ রকম সুযোগও পায়নি।

প্রশ্ন ৫ঃ ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি, (১) ১৯৪৭-১৯৪৮ এবং (২) ১৯৫২-১৯৫৬- আপনি কোন পর্যায়ে ছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার সুবাদে নিজেকে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সুসংগঠিত করার জন্য কাজ করেছি। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে সভা, সমাবেশ ও মিছিল হয়েছে সেগুলোর অধিকাংশতেই আমি অংশগ্রহণ করেছি এবং বক্তব্য রেখেছি। ২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলনকে সফল করার জন্য বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের সংগঠিত করে কলা ভবনের আমতলায় (বর্তমান মেডিকেল কলেজের আউটডোর) সমবেত হয়েছি। আমরা হলের মধ্যে থেকে হলের ছাত্রীরা লিফলেট তৈরি ও বিভিন্ন স্কুল কলেজে তা বিলি

Dhaka University Institutional Repository

করতাম। এছাড়াও ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছি।

প্রশ্ন ৬ ঃ কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন?

উত্তর ঃ দেশ বিভাগের পর পরই যখন ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্ন ওঠে তখন থেকেই আমি এ ব্যাপারে সজাগ ও সচেতন ছিলাম। আমি তখন বরিশাল কলেজে পড়তাম। কলেজের সহপাঠীদের কাছেই প্রথম শুনি যে, বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চে সমগ্র দেশব্যাপী 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন করা হয়। আমি বরিশাল থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে ভাষা আন্দোলনে প্রথম নিজেকে সম্পৃক্ত করি।

প্রশ্ন ৭ ঃ আপনার সাথে আর কে কে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ হালিমা খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার এবং ইডেনের নাম না জানা কতিপয় ছাত্রী।

প্রশ্ন ৮ ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিনের বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারির দিন ইডেন কলেজ ও বাংলা বাজার বালিকা বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীদের সংগঠিত করে আমতলার সভায় নিয়ে আসি। এরপর সিদ্ধান্ত হয় ছেলেরা ১০ জন করে এবং মেয়েরা ৪ জন করে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে বের হবে। আমার দলে ছিলেন শাফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন এবং আরো কয়েকজন ছাত্রী। আমি তাদেরকে নিয়ে পুলিশের লাঠির ব্যারিকেড ভেঙ্গে সামনের দিকে এগুতে থাকি। ব্যারিকেড ভাঙ্গার দৃশ্য দেখলেই পুলিশ এলোপাতারি লাঠিচার্জ শুরু করে। লাঠির আঘাতে আমি আহত হই, তখন আমি বর্তমান শহীদ মিনারের কাছাকাছি। পুলিশের আক্রমনে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং পুলিশ টিয়ারগ্যাস ও গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। উপয়ান্তর না দেখে আমি কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে হলের প্রভোস্ট ডঃ গণির বাসায় আশ্রয় নিই। আন্দোলন একটু স্তিমিত হলে আমি ঢাকা মেডিকেলে আহতদের দেখতে যাই এবং নিহতদের রক্তাক্ত দেহ আমাকে বিমর্ষ করে তোলে এবং আরো লক্ষ্য করি হাসপাতাল থেকে নিহতদের লাশ সরকারের দ্রুত সরিয়ে ফেলার নিন্দনীয় চক্রান্ত। আমি মেডিকেলে থেকে বিকেল পর্যন্ত আহতদের সেবা করি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ৯ ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আমার প্রতিক্রিয়া খুবই বেদনাদায়ক ছিল, যা ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আমাকে তাড়া করেছে। কারণ ১৯৫৩-র মাঝামাঝিতে আমি সিলেটে চলে যাই। কিন্তু সেখানে থেকেও আমি পরবর্তী আন্দোলনকারীদের সমর্থন করেছি। তবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করতে পারায় খুব কষ্ট পেতাম।

প্রশ্ন ১০ ঃ শহীদদের প্রতি প্রথম কোথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন?

উত্তরঃ ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থানে মেডিকেলের ছাত্ররা একটি শহীদ মিনার তৈরি করেন, সেখানেই প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পরে অবশ্য শহীদ মিনারটি পুলিশরা ভেঙ্গে ফেলে।

প্রশ্ন ১১ ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য আপনার সামাজিক অবস্থা কতটা সহায়ক ছিল?

উত্তর ঃ সামাজিক অবস্থা মোটেই সহায়ক ছিল না। যেহেতু আমি হোস্টেলে থাকতাম। কারণ হোস্টেলে কড়াকড়ি নিয়ম বিদ্যমান ছিল। ক্লাশের বাইরে ছেলেদের সঙ্গে কোন পরামর্শ তো দূরে থাক, কথা পর্যন্ত বলতে পারতাম না। কথা বললে ১০ টাকা জরিমানা হতো। এবং স্যাররা আমাদেরকে ক্লাশে যাওয়ার সময় কমনরুম থেকে ডেকে নিয়ে যেতেন। তথাপি আমরা সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গোপনে ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করে আন্দোলনের কর্মসূচি জেনে নিতাম এবং সে অনুযায়ী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতাম।

প্রশ্ন ১২ ঃ আন্দোলনের জন্য পরিবার থেকে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছেন?

উত্তর ঃ আমি রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও বাবা ও মা প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন। বাবা মুসলিম লীগ পন্থী ও সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন। আর এজন্য আমার মধ্যে প্রগতিশীলভাব ধারার জন্ম নেয়। মা সব সময় স্বদেশী গান গাইতেন-'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।' ফলে আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবার থেকে কোনো বাঁধা পায়নি। বলা যায়, পরিবার আমার অনুকূলেই ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১৩ ঃ ১৯৫২ সালের পরবর্তী ফলাফলগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যা ছিল। কারণ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ণতা পায় ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে।

প্রশ্ন ১৪ ঃ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ অবশ্যই সহায়ক ছিল। ভাষা আন্দোলন শুধু ১৯৫২- তে সীমাবদ্ধ ছিল না। আসলে এ আন্দোলনের সূত্র ধরেই ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ১৫ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের নিয়ে আমি খুবই হতাশ। কারণ তারা ভাষা আন্দোলন অথবা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত নেই। আবার ভাষা আন্দোলনের চেতনা কিভাবে আমাদের মর্মমূলে গেঁথে আছে -এ ব্যাপারেও তারা একেবারে অজ্ঞ। তাই বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদেরকে ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হতে হবে এবং ভাষা আন্দোলনের মহৎ চেতনায় তাদেরকে দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হতে হবে।

প্রশ্ন ১৬ ঃ ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের কিভাবে দেখতে চান?

উত্তর ঃ ছাত্রীরা শিক্ষা-দীক্ষা, প্রকৃত আদর্শ ও মতবাদ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। আরো সহজ কথায় বলা যায়, একজন ছাত্রী তার প্রকৃত শিক্ষা থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়।

প্রশ্ন ১৭ ঃ ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করবে এমন কোন উপদেশ দিন-

উত্তর ঃ আমরা বহু ত্যাগ ও তীতিক্ষার ফলে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ছাত্রীরা এই স্বাধীনতার গৌরবকে যেন সমুজ্জ্বল করে তোলে। সকল আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাই আমার প্রত্যাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যেন এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করে তোলে। আর মহান দায়িত্ব তাদেরই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১৮ ঃ জাতির কাছে আপনি কি আশা করেন?

উত্তর ঃ জাতির কাছে আমার যে আশা ছিল তা আজো পূরণ হয়নি। সুন্দর বাংলাদেশ দেখতে চেয়েছিলাম। এখনকার বাংলাদেশ হচ্ছে রক্তাক্ত বাংলাদেশ। আসলে আমরা চায়নি। এখন আমরা আতঙ্কিত বাংলাদেশে বসবাস করছি। আমাদের সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটছে। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতি ঢুকে গিয়ে আদর্শ সংস্কৃতিকে বিকৃতি করছে। ভাষা ও সংস্কৃতি দুটোই চলমান। এ চলমান ধারায় আমরা ভালোকে গ্রহণ করব আর মন্দকে বর্জন করব। সামাজিক অবস্থা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও আমরা ভাষা আন্দোলনের কার্যক্রম থেকে পিছিয়ে পড়িনি। কিন্তু আমাদের নিয়ে কেউ কখনো ভালোমতো আলোচনা করেনি। ভাষা আন্দোলনে মেয়েদের অবদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও তাদেরকে সেভাবে আজো মূল্যায়ন করা হয়নি। জাতি আজ যে পর্যায়ে গিয়েছে- তা আমাদের কাম্য ছিল না। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ সবার মধ্যে জাগ্রত করে তুলতে হবে। শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থে নয়, দেশের কল্যাণের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য সব সময় নিয়োজিত থাকতে হবে। ব্যক্তি বা দলের স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে দেশকে ভালোবাসতে হবে। যেমন আমরা বেসেছি। সালাম, বরকত, রফিকের সঙ্গে আমরাও শহীদ হতে পারতাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেদিন বেঁচে গেছি। আমরা দেশকে ভালোবেসে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

প্রশ্ন ১৯ ঃ ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সুতরাং ২১ ফেব্রুয়ারি বা হয়ে বাংলা মাস ৮ ফাল্গুন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

উত্তর ঃ জোড়ালোভাবে প্রশ্নের স্বপক্ষে মতামত জ্ঞাপন করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার-২

হালিমা খাতুন

প্রশ্ন ১ ঃ ১৯৫২ সালে আপনার বয়স কত ছিল?

উত্তরঃ আনুমানিক ২৪ বছর।

প্রশ্ন ২ ঃ ১৯৫২ সালে আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের এম. এ. ক্লাশের ছাত্রী ছিলাম।

প্রশ্ন ৩ ঃ বর্তমানে আপনার পেশা কি?

উত্তর ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে IER বিভাগে শিক্ষকতা করতাম। বর্তমানে অবসরে আছি এবং লেখালেখি করে সময় কাটাই।

প্রশ্ন ৪ ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার প্রথম অনুভূতি কি রকম ছিল?

উত্তর ঃ ১৯৪৮ সালে এইচ. এস. সি পাশ করি। তখন বাগেরহাটে ছিলাম। ভাষা সম্পর্কিত সমস্যার কথা সেখানেই শুনি এবং একাত্মতা ঘোষণা করি।

প্রশ্ন ৫ঃ ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি, (১) ১৯৪৭-১৯৪৮ এবং (২) ১৯৫২-১৯৫৬- আপনি কোন পর্যায়ে ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি ভাষা আন্দেলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলাম। আমি এ সময় পোস্টার লিখন, পিকেটিং এবং মুসলিম গার্লস স্কুলের মেয়েদের সংঘবদ্ধ করে আমতলায় আহূত সমাবেশে সমবেত করি।

প্রশ্ন ৬ ঃ কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন?

উত্তর ঃ আসলে কবে, কখন কিভাবে নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করি তা স্পষ্ট মনে নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পার পরই কিভাবে যেন আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। ১৯৫২-র একুশ ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলনের দিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী মিছিলে অংশ নিয়েছিলাম।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ৭ঃ আপনার সাথে আর কে কে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমার সঙ্গে ছিল রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহিম, শামসুন্নাহার, সাফিয়া খাতুন, জোলেখা হক, আকতারি, পারুল, নূরি প্রমুখ।

প্রশ্ন ৮ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিনের বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পেছনে ছাত্রীদের জোর ছিল বেশি। তখন সবাই এর পক্ষে রায় দেয়। সিদ্ধান্ত হলো-মেয়েরা ৪ জন ৪ জন করে আর ছেলেরা ১০ জন ১০ জন করে বের হবে। পুলিশের বাঁধা ভেঙ্গে গেট দিয়ে বের হলাম। পুলিশের বন্দুক দুহাতে ঠেলে দিয়ে সাহস করে সামনে দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ। শাফিয়ার সঙ্গে যে আটজন ছিল পুলিশ তাদেরকে ধরে নিয়ে যায়, পরে অবশ্য ছেড়ে দেয়। এরপর আরো বেশি ও টিয়ারগ্যাস ছোঁড়া হচ্ছিল। চোখ জ্বালা করছিল। ভলান্টিয়াররা বালতি করে পানি এনে দিয়েছিল। তার পরে সরকার বিরোধী স্লোগান আরো বেশি জোরদার হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর এগুতে না পেরে মেডিকেলে ঢুকে পড়লাম। ছাত্ররা ইট ছুঁড়ছিল। আনুমানিক বেলা তিনটার পরে গুলিবর্ষণ হতে থাকে। আহতদের আর্তনাদ, পুলিশের হুঙ্কার , ছাত্রছাত্রীদের স্লোগান সব মিলিয়ে রণক্ষেত্র পরিণত হয়। পরে দেখলাম রফিকের মাথায় মগজ বকুল ফুলের মতো থোকা থোকা হয়ে ছড়িয়ে আছে। পরে শুনেছি অনেক মৃতদেহ পুলিশ গুম করেছে।

প্রশ্ন ৯ ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আমার প্রতিক্রিয়া ছিল বেদনাদায়ক। শুধুই চোখের সামনে ভাসছিল রফিকের মাথার মগজ, রক্তভেজা লাল কাপড়, আহতদের আর্তনাদ আর মনের মধ্যে জেগে ওঠে অদম্য জেদ।

প্রশ্ন ১০ ঃ শহীদদের প্রতি প্রথম কোথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন?

উত্তর ঃ আজিমপুর কবরস্থানে প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

প্রশ্ন ১১ ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য আপনার সামাজিক অবস্থা কতটা সহায়ক ছিল?

উত্তর ঃ সামাজিক অবস্থা মোটেই সহায়ক ছিল না। হোস্টেল কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। শিক্ষক সঙ্গে করে ক্লাশে নিয়ে যেতন এবং কমনরুম দিয়ে যেতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ মাইলের মধ্যে কোনো ছেলের সঙ্গে কথা বলা যেত না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১২ ঃ আন্দোলনের জন্য পরিবার থেকে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছেন?

উত্তর ঃ পরিবার ছিল যথেষ্ট রক্ষণশীল। কিন্তু আমার বাবা, মাবাগেরহাটে থাকার সুবাদে পরিবার থেকে কোনো বাধা বিপত্তি ও চাপের মুখে পড়িনি।

প্রশ্ন ১৩ ঃ ১৯৫২ সালের পরবর্তী ফলাফলগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ ছিল। যদিও পরবর্তী আন্দোলনগুলোর সঙ্গে আমার কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। ফলাফলগুলো যদি প্রত্যাশা অনুযায়ী না হতো তাহলে বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেত না।

প্রশ্ন ১৪ ঃ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দালন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সহায়ক ছিল। আর তা না হলে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করতে পারতাম না। আসলে স্বাধিকার আদায়ের চেতনা ভাষার লড়াই থেকে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ১৫ ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ আমরা যখন ছাত্রী ছিলাম তখন আমাদের মধ্যে একটা বোধ কাজ করতো-যাকে জাতীয়তাবোধ বলে। কিন্তু এখনকার ছাত্রীদের মধ্যে তার বড়ই অভাব।

প্রশ্ন ১৬ ঃ ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের কিভাবে দেখতে চান?

উত্তর ঃ সত্য, সুন্দর, ন্যায়, মনমানসিকতা এবং দেশপ্রেমিক হিসেবে দেখতে চাই। সুন্দর একটা দেশ, সমাজ, মানুষের যতটুকু বিকাশ সম্ভব-ততটুকুই যেন তারা করে। আর সেখানেই মানুষের অস্তিত্ব এবং ভাষার তারা করে। আর সেখানেই মানুষের অস্তিত্ব এবং ভাষার কাজ সেখানেই।

প্রশ্ন ১৭ ঃ ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করবে এমন কোন উপদেশ দিন-

উত্তর ঃ বাণী দেয়ার মতো বৃহৎ ব্যক্তি আমি নই। নেহাতই একুশের সেই মহালগ্নে হাজির ছিলাম। তাই ইতিহাসের অংশ হতে পেরেছি। তাছাড়া আর কোনও কৃতিত্ব আমার নেই। তখন আমি এম. এ ক্লাশের ছাত্রী মাত্র। আমি ১৯৫২ সালের কথা বলছি। সেদিন যে প্রতিজ্ঞা ছিল আজও আমাদের সেই প্রতিজ্ঞা- অত্যাচার আর শোষণের অবসান হোক দেশ থেকে, পৃথিবী থেকে। প্রত্যেকটি মানুষ যেন

Dhaka University Institutional Repository

তার মানস ও দক্ষতা মত কাজ করার সৎ রুচি যোগাড় করতে পারে, স্বাধীনভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে জীবনের সব দায় দায়িত্ব পালন করে মানবতার সেবা করতে পারি। একুশ শুধু একদিনের নয়, একুশ সারাজীবনের। একুশের আদর্শ সব মানুষের আদর্শ হোক। আমরা সবাই যেন সত্যিকার ভাবে ভাষার সেবক হতে পারি। তাই বলে অন্য ভাষা শিখবো না, তা নয়, যতো ইচ্ছা ভাষা শিখতে পারি, প্রয়োগ করতে পারি। অন্য ভাষার কাব্য সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে সারাজীবনের রশদ সংগ্রহ করতে পারি। তবে মাতৃভাষার বিনিময়ে নয়। মাতৃভাষার অমৃত আমাদের পরম ধন। মাতৃভাষা আমাদের বিকশিত করে সমৃদ্ধ করে পূর্ণতা দান করে। মাতৃভাষার প্রকৃত চর্চা লালন ও উন্নয়ন হোক আমাদের জীবনের ব্রত।

প্রশ্ন ১৮ ঃ জাতির কাছে আপনি কি আশা করেন?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সঠিকভাবে দলিল করা হোক, বাংলাভাষাকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছি- যা বিশ্ববাসী স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু শহীদ পরিবার আজো অবহেলিত, তাদের জন্য কিছু করা হোক। যে উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা ভাষার জন্য লড়াই করেছি সে উদ্দেশ্যের লালন, ভাষার চর্চা সর্বস্তরে তার ব্যবহার, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ, মানসিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ, রাজনৈতিক সুস্থিরতা সমস্ত অন্যায় ও অসৎ পন্থা পরিহার করে, সত্যিকারের জ্ঞানের সাধনা এবং দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা।

প্রশ্ন ১৯ ঃ ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সুতরাং ২১ ফেব্রুয়ারি না হয়ে বাংলা মাস ৮ ফাল্গুন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

উত্তর ঃ আমি এ ব্যাপারে একমত পোষণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার-৩

রওশন আরা চৌধুরী রেনু

প্রশ্ন ১ ঃ ১৯৫২ সালে আপনার বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ আনুমানিক ২৩ বছর।

প্রশ্ন ২ঃ ১৯৫২ সালে আপনি কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ বরিশাল বি. এম. কলেজের ছাত্রী ছিলাম। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হই।

প্রশ্ন ৩ঃ বর্তমানে আপনার পেশা কি?

উত্তর ঃ আমি IER-এর শিক্ষক ছিলাম। বর্তমান অবসর সময় কাটাচ্ছি। তবে নিজেকে সমাজ সেবার সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছি।

প্রশ্ন ৪ ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার প্রথম অনুভূতি কি রকম ছিল?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে প্রথম জেনেছি বরিশালে আমার পরিবারের মাধ্যমেই। এবং ভাষা আন্দোলন কি তা বাবার কাছ থেকে জেনেছি। বাবা মুসলিম লীগ করতেন তবুও বাংলা ভাষার প্রতি আগ্রহ ছিল বলেই পরিবার থেকেই ভাষা সম্পর্কিত ধারণা লাভ করি ।

প্রশ্ন ৫ ঃ ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি, (১) ১৯৪৭-১৯৪৮ এবং (২) ১৯৫২-১৯৫৬- আপনি কোন পর্যায়ে ছিলেন?

উত্তরঃ ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলাম। ১৯৫৪ সালে ঘটনা- প্রভাতফেরি এবং কালো পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ ছিল। তাই কালো কাপড় বাজার থেকে কিনে আনা সম্ভব হয়নি। রান্নাঘরে গিয়ে কয়লা দিয়ে কাপড়কে কালো করে পতাকা তুলেছি। সকল কর্মকাণ্ডের উপর ১৪৪ ধারা চলছিল। মিটিংয়ের উপর হঠাৎ পুলিশের লাঠিচার্জ শুরু হলে দেখি রক্ত এবং পুলিশ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ধরার জন্য খুঁজছে। আমরা তখন বান্ধবীদের নিয়ে বসে আছি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে তবুও পুলিশ আমাদের খুঁজছে। উপায়ন্তর না দেখে আমিই প্রথম পুলিশের হাতে ধরা দেয়ার জন্য যাই। এরপর একে একে সবাই ধরা দেয়। আমাদেরকে ট্রাকে করে লালবাগ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা ২৫ জনের মতো ছাত্রী ছিলাম। এরপর আমাদেরকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যায়। ছেলেদের কোথায় নিয়ে যায়, জানিনা। আমরা ১২ দিন জেলে ছিলাম। জেলে কষ্ট হচ্ছিল, তারপরও মনে হতে থাকে আমরা যেন উৎসব করছি। শেষের দিকে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি। পুরনো ঢাকা লোকেরা আমাদের জন্য সব সময় খাবার পাঠাত। একদিন হঠাৎ করে বাবা জেলে গেলেন। আমাকে বললেন একটা কাগজে স্বাক্ষর দিতে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিসের এবং কেন। তখন বাবা বলেছিলেন তোমাকে স্বীকারোক্তি দিতে হবে-'আমি যা করেছিল ভুল করেছি'। আমি তখন কাগজে আর স্বাক্ষর দেইনি। এভাবে একে একে অনেককেই তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে বন্ড দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সবশেষে আমরা ১২-১৩ জন ছাত্রী জেলে ছিলাম। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত এ ঘটনা আমার কাছে স্মরণীয়।

প্রশ্ন ৬ ঃ কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন?

উত্তর ঃ ১৯৫৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর চামেলি হাউজে ওঠি। হলে অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমেই নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করি। ১৯৫৪ সালে ২১ ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে যাওয়ার মাধ্যমেই প্রথম ভাষা আন্দোলন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করি।

প্রশ্ন ৭ ঃ আপনার সাথে আর কে কে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আন্দোলনে আমার সঙ্গে ছিলেন তটিনী দাস, লাইলুন নাহার, আনোয়ারা সিদ্দিক, সানজিদা খাতুন, প্রতিভা মুৎসুদ্দি, কামরুন্নাহার লাইলি প্রমুখ।

প্রশ্ন ৮ ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিনের বর্ণনা করুন?

উত্তরঃ ১৯৫২ সালের বরিশালে ছিলাম। কিন্তু বাবার কাছ থেকে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনা শুনে হতবাক হই।

প্রশ্ন ৯ ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর ঃ আমি খুবই মর্মাহত হই। যেহেতু আন্দোলনটা ঢাকায় বেগবান ছিল সেহেতু ঢাকার বাইরে বসে দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমার করার কিছু ছিল না।

প্রশ্ন ১০ঃ শহীদদের প্রতি প্রথম কোথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন?

উত্তর ঃ প্রথমে কোনো শহীদ মিনারে নয়, আজিমপুর কবরস্থানে প্রথম ফুল দিই। ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালের প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১১ ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য আপনার সামাজিক অবস্থা কতটা সহায়ক ছিল?

উত্তর ঃ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ছিল। তারপরেও তা উপেক্ষা করে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিই। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সম্পর্কে অনেক খারাপ মন্তব্য করা হতো।

প্রশ্ন ১২ ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য পরিবার থেকে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছেন?

উত্তর ঃ পরিবার থেকে ইতিবাচক উৎসাহ পেয়েছি। যদি তা না হতো তাহলে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর হোস্টেলে না গিয়ে বাবার সঙ্গে বাড়িতে চলে যেতে হতো।

প্রশ্ন ১৩ ঃ ১৯৫২ সালের পরবর্তী ফলাফলগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ ছিল। যদি ১৯৫২-তে আন্দোলন থেমে থাকত তাহলে ১৯৫৬- তে তা পরিণতি লাভ করতে পারত না। তখনকার মানুষ দেশ নিয়ে বেশি ভাবত বলে আন্দোলনের সঙ্গে খুব সহজেই নিজেকে সম্পৃক্ত করতো।

প্রশ্ন ১৪ ঃ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ আন্দোলনগুলো সঠিক পথেই চলেছিল। একটা আন্দোলনের ফলশ্রুতি পরবর্তী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। আসলে একটা আন্দোলন অন্য একটা আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়েছে। তাই বলতে হয় ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই পরবর্তী অন্যান্য আন্দোলনগুলো এসেছে। আর এর পরিণতিতে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশকে পেয়েছি।

প্রশ্ন ১৫ ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ বর্তমানের ছাত্রীরা বাস্তববাদী এবং আত্মকেন্দ্রিক। তাদের ধারণা আমাদের ধারণা থেকে ভিন্ন। তারা নিজেকে বড় করে দেখে। তারা তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কোনো কিছুই নিয়েই চিন্তিত নয়। বলা যায় সচেতনও নয়। আমাদের সময় ধর্মীয় উন্মাদনা ছিল কিন্তু এখনকার ছাত্রীরা এদিক থেকে সচেতন। তারা এসবকে মূল্য দেয় না। কিন্তু আমাদের সময় তা না দিয়ে উপায় ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যারা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে মোসলেমা খাতুন, মনোয়ারা ইসলাম, মেরী মনোয়ার, রওশন আহমেদ দোলন অন্যতম। তারা সবাই ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। কেউ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য ছাত্রীদের সংগঠিত করেছেন, কেউ চাঁদা তুলেছেন এবং প্রায় সবাই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির দিনে যেসব ছাত্র আহত হয়েছিলেন তাদেরকে দেখার জন্য মেডিকেলে যান। আর যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের জন্য এসব ছাত্রীদের বেদনা ছিল করুণ স্পর্শী। তারা সবাই ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে যুগিয়েছেন শক্তি, সাহস ও অনুপ্রেরণা এবং তাদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মহিমায় ভাষা আন্দোলন সার্থকতার পথে এগিয়ে গেছে এ কথাটি অন্তত জোরের সঙ্গেই বলা যায়। তাই ভাষা আন্দোলন সফল করার ক্ষেত্রে এসব মহিয়সী ছাত্রীদের অবদান স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পাতায় উজ্জীবিত হয়ে থাকবে বলে আমার ধারণা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১৬ ঃ ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের কিভাবে দেখতে চান?

উত্তর ঃ ছাত্রীরা ন্যায়নুগত বা আদর্শ ছাড়া মানুষ পদবাচ্য হতে পারে না। তারা যেন নৈতিকতাকে বিসর্জন না দেয়। ভোগের পরেও মানুষের মন ও দায়বদ্ধতা আছে। তারা যেন সেগুলো সম্পর্কে সচেতন হয়।

প্রশ্ন ১৭ ঃ ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করবে এমন কোন উপদেশ দিন-

উত্তর ঃ Be true, true yourself-অর্থাৎ নিজের কাছে সৎ থাক।

প্রশ্ন ১৮ ঃ জাতির কাছে আপনি কি আশা করেন?

উত্তর ঃ আমার আশা সীমাবদ্ধ ন্যায়ানুগতাকেই ঘিরেই। আমরা যেন সারা বিশ্বে সৎ জাতি হিসেবে পরিচিত হতে পারি। পশ্চিমা দেশের মানুষের মধ্যে অনেক ভুল থাকলেও তারা খুব সৎ। সারা বিশ্ব থেকে বিভিন্ন জাতির ভালো দিকটাই আমরা গ্রহণ করবো-এটাই আমার আশা।

প্রশ্ন ১৯ ঃ ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সুতরাং ২১ ফেব্রুয়ারি না হয়ে বাংলা মাস ৮ ফাল্গুন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

উত্তর ঃ আমি এই মতামতের সঙ্গে একমত পোষণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিভা মুৎসুদ্দি

প্রশ্ন ১ ঃ ১৯৫২ সালে আপনার বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ ১৮ বছর।

প্রশ্ন ২ ঃ ১৯৫২ সালে আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালে চট্টগ্রাম কলেজে আই. এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলাম।

প্রশ্ন ৩ ঃ বর্তমানে আপনার পেশা কি?

উত্তর ঃ আমি ১৯৬৩ সাল থেকে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'কমুদিনী'র সঙ্গে বর্তমান পর্যন্ত সম্পৃক্ত রয়েছি। সমাজ সেবাই আমার ধর্ম।

প্রশ্ন ৪ ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার প্রথম অনুভূতি কি রকম ছিল?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলন দেশবিভাগের পরপরই শুরু হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হলো ৪৮ সালে কায়েদি আজম ঘোষণা করেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তখন আমি গ্রামের স্কুলের (মহামুনি এ্যাংলো পালি ইনস্টিটিউশন) অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, কিন্তু রাজনীতির কিছু বুঝি না। কিন্তু তখনই স্কুলের বড় ভাইদের কাছে শুনলাম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের (৫৬%) ভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে ৪৪% মানুষের ভাষা উর্দুকে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে কিশোর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৫ ঃ ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি, (১) ১৯৪৭-১৯৪৮ এবং (২) ১৯৫২-১৯৫৬- আপনি কোন পর্যায়ে ছিলেন?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম থেকে জড়িত থাকলেও আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি দ্বিতীয় পর্যায়ে। ১৯৫২ সালে সারা দেশে সব পেশাজীবী মানুষের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের উত্তাল স্রোত বইতে থাকে- কারণ ২১ ফেব্রুয়ারি নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। সেই থেকে ভাষা আন্দোলনের জোয়ার বয়ে চলে। ১৯৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সালে নির্বাচনের পর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হই। তখন থেকেই ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি। ফেব্রুয়ারি মাস জাগরণের মাস, পুনঃ অঙ্গীকার নেওয়ার মাস হিসেবে আমরা পালন করতাম। কালো ব্যাজ পরে নগ্ন পায়ে শহীদদের মাজারে গিয়ে শপথ নিতাম। তোমাদের রক্ত বৃথা যেতে দবে না। পুলিশের নজর এড়িয়ে প্রতিষ্ঠানেও নানা জায়গায় কালো পতাকা উত্তোলন আমাদের ভোরের কাজ হতো। ১৯৫৫ সালে আমাদের সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা। কথা ছিল আমরা পরীক্ষার্থীরা ২১ ফেব্রুয়ারি আমতলার মিটিং-এ যাবো না। সেদিন ১৪৪ ধারা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ১১ টার দিকে খবর পেলাম সকালে মিটফোর্ড ও মেডিকেল কলেজের কয়েকজন ছাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিদ্রোহের আগুন তখন আমাদের মধ্যে। আমি ও কামরুন নাহার লাইলী একটি দল নিয়ে উইমেন্স হল (বর্তমান রোকেয়া হল) থেকে শোভাযাত্রা করে এগিয়ে দেখি রাস্তার দুধারে হেলমেট পরিহিত বন্দুকধারী মিলিটারী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। তাদের মাঝখান দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং-এর আমতলায় সমবেত হলাম। একজন ছাত্রনেতা (নাম মনে নেই) বক্তৃতা করছিলেন। হঠাৎ দেখি পুলিশের লাঠিচার্জ শুরু হয়েছে-ছাত্রছাত্রীরা ছত্রভঙ্গ। পুলিশের লাঠির ঘা আমার গায়েও গুটিকতক পড়ে। একজন ছাত্র আমাকে কোলে করে বারান্দায় পৌঁছে দেয়। আমরা দোতলায় ছাত্রীদের কমনরুমে গেলাম। সেখান থেকে দেখলাম মিলিটারী, মধুর ক্যান্টিন, কমার্স বিল্ডিং ও একতলা থেকে ছাত্রদের ধরছে। কেউ কেউ দেয়াল টপকে মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে আত্মরক্ষা করছে। আমরা ৭ জন, আমি, কামরুন নাহার লাইলী, ফরিদা বারি মালিক, হোসনে আরা আপা, লায়লা নুর ও আরো দু'জন বেশ কয়েক ঘন্টা পর লাইব্রেরীতে যাই। লাইব্রেরীয়ান কার্ড ছাড়াই আমাদের বই দিলেন। যখন প্রায় সন্ধ্যা তখন আমরা ঠিক করলাম আলাদাভাবে ধরা না দিয়ে এক সাথেই ধরা দেবো। আমরা সারিবদ্ধ হয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গেইটে পৌঁছাই তারা আমাদের ভ্যানে উঠতে নির্দেশ দিল। ঐ সময় যত ছাত্র ক্যাম্পাসে লুকিয়ে ছিল সবাই এগিয়ে এলো প্রায় কয়েক শত ছাত্র-ছাত্রী। প্রথম আমাদের লালবাগ থানায় নিল-প্রত্যেকের নামে আলাদা ওয়ারেন্ট লিখলো। এরপর রাতে কেন্দ্রীয় কারাগারে। আমাদের যে কক্ষে জায়গা হলো-সেখানে আগে ছিলেন রাজনৈতিক বন্দীরা। তারা আমাদের জন্য শুভেচ্ছা রাখলেন। কয়েদীদের বলে গেলেন আমরা যেন কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দাবি করি। কারাগারে প্রতিদিন ভোরে আমরা উচ্চস্বরে গান গাইতাম। -----

১. ভুলবনা ভুলবনা সেই ২১ ফেব্রুয়ারি

লাঠি গুলি টিয়ারগ্যাস

মিলিটারী আর মিলিটারী

Dhaka University Institutional Repository

২. বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা
আজ জেগেছে সেই জনতা

৩. কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট

৪. জাগো অনশন বন্দী ওঠোরে যত।

সামনে ছিল আমাদের পরীক্ষা। পক্ষকাল পর আমরা ছাড়া পেলাম। এ গণজোয়ারের পর পরই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রশ্ন ৬ ঃ কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন?

১৯৪৮ সালে আমি গ্রামের স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। তখন স্কুলের বড় ভাইদের কাছ থেকেই ভাষা সমস্যাটি সম্পর্কে অবগত হই। আমাদের স্কুলের (মহামনি এ্যাংলো পালি ইনস্টিটিশন) দশম শ্রেণীর ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দেবপ্রিয় বড়ুয়ার নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন গঠন করে। দশম শ্রেণীর ছাত্র সুনীল আইচ ছাত্রীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দিল আমার ওপর। রাজনীতি বুঝতাম না, কিন্তু বুঝতাম মাতৃভাষা মর্যাদা না পেলে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাই নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য গ্রুপে গ্রুপে সংঘবদ্ধ হতে থাকি। এভাবেই বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ৭ ঃ আপনার সাথে আর কে কে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমরা ৭ জন ছিলাম। আমি, কামরুন নাহার লাইলী, ফরিদা বারী মালিক, হোসনে আরা আপা, লায়লা নূর ও আরো দুইজন।

প্রশ্ন ৮ ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিনের বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিন ছেলেদের কাছ থেকে শুনলাম ঢাকায় ভাষা আন্দোলনে মিছিলের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছে এবং এতে কয়েকজন নিহত ও অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘটনাটি শুনার পর আমাকে ও আমার অন্যান্য সহপাঠীদের মারাত্মকভাবে আন্দোলিত করে। এ ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ চট্টগ্রাম কলেজ থেকে ট্রাকে ওঠে খাস্তদির স্কুলের সামনে এসে স্লোগান দিতে শুরু করলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন তালেয়া রহমান, বিনোদিনী, জুলেখা দি, রওশন আরা এবং খাস্ত দির স্কুলের ছাত্রী হালিমা এবং এর সঙ্গে ছাত্ররাও ছিল। আমরা স্লোগান দিতে দিতে ট্রাকে করে সমগ্র চট্টগ্রাম শহর প্রদক্ষিণ করি আমি।

প্রশ্ন ৯ ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পরে কয়েকদিন ধরে মিছিল সমাবেশ চলতে থাকে এবং স্লোগান ধ্বনিত হয়- 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' খুনি সরকার চাই না। যদিও তখনকার দিনে মিছিল নিয়ে মেয়েদের বের হওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল, তারপরও আমরা বের হয়েছিলাম।

প্রশ্ন ১০ ঃ শহীদদের প্রতি প্রথম কোথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন?

উত্তর ঃ ১৯৫৪ সালে খালি পায়ে হেঁটে প্রভাতফেরিতে বের হই এবং প্রথম আজিমপুর কবরস্থানে ফুল দিয়ে শহীদদের শ্রদ্ধা জানায়। শুধু একুশ ফেব্রুয়ারিতে নয়, আমরা মাঝে মাঝেই এখানে আসতাম এবং সেখানে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতাম "ভাষার জন্য, স্বাধিকারের জন্য তোমরা যারা প্রাণ দিয়েছ। আমরা তা বৃথা যেতে দেবো না আমরা লড়ে যাবো সকল রকম বৈষম্যের বিরুদ্ধে"।

প্রশ্ন ১১ ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য আপনার সামাজিক অবস্থা কতটা সহায়ক ছিল?

উত্তর ঃ সামাজিক অবস্থা অনুকূলে ছিল না। কারণ মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে বা মেয়েরাও যে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারে সে ব্যাপারে সমাজ ছিল অজ্ঞ। তাই মেয়েদেরকে তখন পর্দার অন্তরালে রাখার চেষ্টাই করা হতো।

প্রশ্ন ১২ ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য পরিবার থেকে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছেন?

উত্তর ঃ পরিবার থেকে সমর্থন-এক কথায় বলতে গেলে পেয়েছি আবার পাইনি। আমার বাবা ছাত্র ফেডারেশন পছন্দ করতেন না। মাঝে মাঝে মারও খেয়েছি। তবে মা, ঠাকুর মা আমাকে সমর্থন করতেন। আমার জৈষ্ঠুত ভাই সংঘমিত্র মৎসুদ্দি আর্যমিত্র মুৎসুদ্দির কাছ থেকে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১৩ ঃ ১৯৫২ সালের পরবর্তী ফলাফলগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল কি?

উত্তর ঃ প্রত্যশা অনুযায়ী ছিল। কারণ আমরা আন্দোলন করে, মিছিল করে, সভা সমাবেশ করে- এমনকি জেলে পর্যন্ত গিয়েছি, আমাদের প্রত্যাশানুযায়ী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করার জন্য।

প্রশ্ন ১৪ঃ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন না হলে স্বাধীনতা আন্দোলন সফল করা সম্ভব হতো না। পরবর্তীতে প্রত্যেকটা অধিকার অর্জন করার জন্য যে সংগ্রাম আমি মনে করিতা ভাষা আন্দোলনেই নীহিত ছিল।

প্রশ্ন ১৫ ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীরা অনেকেই ভাবে তারা কেমন করে ভালো রেজাল্ট করবে, কেমন করে ভালো চাকুরী করবে আবার কেউ ভাবে নেতা হওয়ার কথা, আসলে আমাদের নেতারা ছাত্র-ছাত্রীদের নেতা-নেত্রী বানিয়ে লেজুড় ভিত্তি করে শেষ করে দিয়েছে। তবে সব সময় একই পরিস্থিতি বর্তমান থাকে না। তাই বর্তমান ছাত্রীদের উচিত হবে মহৎ চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং দেশের স্বার্থে কাজ করা।

প্রশ্ন ১৬ ঃ ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের কিভাবে দেখতে চান?

উত্তর ঃ ভবিষ্যতে ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা ও আজকের যুগের উপযোগী শিক্ষা এবং আমাদের যে ধর্ম তথা মানবাধিকারের ধর্মকে চর্চা করতে হবে। ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্য ধর্ম-এটা আমাদের সবাইকে লালন করতে হবে।

প্রশ্ন ১৭ ঃ ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করবে এমন কোন উপদেশ দিন-

উত্তর ঃ দেশ আর দেশের মানুষের উপরে কিছুই নেই। তোমার ঘরে যে রকম তোমার কতর্ব্য আছে সমাজের প্রতিও তদ্রুপ তোমার কর্তব্য আছে। সুতরাং নিজস্ব দায়িত্ব ও কতব্যে অবহেলা করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১৮ঃ জাতির কাছে আপনি কি আশা করেন?

উত্তর ঃ একটা শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধশালী ভালোবাসার দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে দেখতে চাই।

প্রশ্ন ১৯ঃ ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সুতরাং ২১ ফেব্রুয়ারি না হয়ে বাংলা মাস ৮ ফাল্গুন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

উত্তর ঃ আমি এ ব্যাপারে অবশ্যই একমত পোষণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার-৫

সুফিয়া আহমেদ

প্রশ্ন ১ ঃ ১৯৫২ সালে আপনার বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ ১৮ বছর।

প্রশ্ন ২ ঃ ১৯৫২ সালে আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলাম।

প্রশ্ন ৩ ঃ বর্তমানে আপনার পেশা কি?

উত্তর ঃ বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। এছাড়াও বিভিন্নসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছি।

প্রশ্ন ৪ ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার প্রথম অনুভূতি কি রকম ছিল?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রথম অনুভূতি বাবার কাছ থেকেই এসেছে। বাবা তখন জেল জজ ছিলেন। বাবা ভাষা সম্পর্কিত কথাবার্তা চিঠির মাধ্যমে তার বন্ধুদের সঙ্গে মত আদান-প্রদান করতেন। চিঠির খসড়াগুলো তৈরির কাজে আমি বাবাকে সাহায্য করতাম। আর এখান থেকে ভাষা সম্পর্কিত সমস্যা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং বাংলা ভাষার প্রশ্নটির সঙ্গে আমি একাত্মতা পোষণ করি।

প্রশ্ন ৫ ঃ ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি, (১) ১৯৪৭-১৯৪৮ এবং (২) ১৯৫২-১৯৫৬- আপনি কোন পর্যায়ে ছিলেন?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের উভয় পর্যায়ে আমি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছি। প্রথম পর্যায়ে বয়স অল্পছিল বলে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাবার কার্যক্রমে সহযোগিতা করে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছি-এটাই মনে হয়। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমার সুযোগ এলো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার। এবং তা

Dhaka University Institutional Repository

করি। এ পর্যায়ে আমি ভাষা আন্দোলনকে সফল করার জন্য অনুষ্ঠিত সভা, সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রীদের সংগঠিত করা, চাঁদা তোলাসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত দিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য ছাত্রীদের যে মিছিল বের হয় তার অগ্রভাগে আমি ছিলাম।

প্রশ্ন ৬ ঃ কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন?

উত্তর ঃ দিনক্ষণ হিসেব করে বলতে পারব না। আসলে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে প্রথম থেকেই সচেতন ছিলাম। তবে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করি ১৯৫২ সালেই।

প্রশ্ন ৭ ঃ আপনার সাথে আর কে কে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমার সঙ্গে ছিলেন শাফিয়া খাতুন, শামসুন নাহার, রওশন আরা বাচ্চু আর একজন ইডেন কলেজের ছাত্রী।

প্রশ্ন ৮ ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিনের বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ আমি যেহেতু হোস্টেলে থাকতাম না, তাই বাসা থেকে সরাসরি কলা ভবনের আমতলায় এসে সমবেত হই। এবং সেখানে যে সভা হয় তাতে অংশগ্রহণ করি। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হয়ে। প্রথমে ছাত্রদের দু'তিন টি দল রাস্তায় নামে। এরপর ছাত্রীদের প্রথম যে দলটি বের হয়, সে দলে আমি ছিলাম। আমাদের মিছিলটি যখন আইন পরিষদের (বর্তমান জগন্নাথ হল) দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল রাস্তায় তখন অসংখ্য পুলিশ। এ সময় আমার দেখা হয় এস.পি মাসুদ মাহমুদের সঙ্গে। আমার বাবার সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদে তিনি আমাদের বাড়িতে যেতেন। আমাকে দেখামাত্রই তিনি বললেন, "প্রসেশনে আসাটা তোমার ভুল হয়েছে। সরকার আমাদেরকে বিক্ষোভকারীদের কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বাসায় চলে যাও, তা নাহলে তোমারও বিপদ হতে পারে।" তার কথাগুলো তখন আমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছিল। কারণ সরকারি কর্মচারী বলেই এ ধরনের কথা বলেছেন-এটা ভেবে। কিন্তু একটু পরেই মিছিলের উপর প্রচণ্ড ভাবে পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে মিছিলকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। কোনো রকমে সেখান থেকে পার হয়ে মেডিকেল কলেজের দিকে যাই। তখন বিক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষে পুলিশের দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। কারণ পুলিশেরগুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত ও অসংখ্য মানুষ আহত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ৯ ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর ঃ ঘটনার পরবর্তীতে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এ দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করি। আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন। আমরা কয়েকজন মিলে মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে ভাষা আন্দোলনকে আরো গতিশীল করে তোলার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন ১০ ঃ শহীদদের প্রতি প্রথম কোথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন?

উত্তর ঃ ১৯৫৩ সালের প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করি এবং আজিমপুর কবরস্থানে শহীদরে প্রতি প্রথম শ্রদ্ধা জানাই।

প্রশ্ন ১১ ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য আপনার সামাজিক অবস্থা কতটা সহায়ক ছিল?

উত্তর ঃ তখনকার দিনে বলতে গেলে সামাজিক অবস্থা কোনো মেয়েরই অকুকূলে ছিল না।

প্রশ্ন ১২ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য পরিবার থেকে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছেন?

উত্তর ঃ পরিবারের কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেয়েছি। প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন আমার বাবা। এছাড়াও সিনিয়র ছাত্রনেতাদের কাছ থেকেও উৎসাহ পেয়েছি। আন্দোলনের জন্য কখন কোথায় আসতে হবে এ খবর তারাই আমাকে পৌঁছে দিতেন।

প্রশ্ন ১৩ ঃ ১৯৫২ সালের পরবর্তী ফলাফলগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল কি?

উত্তর ঃ ফলাফল প্রত্যাশা অনুযায়ীই ছিল। তা নাহলে ১৯৫৬ সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃতি পেত না।

প্রশ্ন ১৪ ঃ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ সহায়ক তো বটেই। আসলে ভাষা আন্দোলন থেকেই তো শুরু স্বাধিকার আন্দোলনের ডাক। কারণ তখনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম পাকিস্তান সরকার আমাদের স্বাধীন সত্ত্বাকে মেনে নিতে পারছে না। আর সেজন্যই ভাষার মাধ্যমে প্রথম প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আর তখনই মনে হয়েছে আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে। এভাবেই আমাদের পরিণতি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১৫ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ এখনকার ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। এখন আমি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে একই পর্যায়ে দেখবো-আর এটাই আমার ভালো লাগবে। এখনকার ছাত্রীদের মধ্যে যা দেখতে পাই, তা তেমন কিছু না। এখন বাঙালীরা অনেক বেশি স্বচ্ছল, বাস্তবতার সঙ্গে কোনো মিল নেই। এখনকার অনেক ছাত্রীই জানে না ভাষা আন্দোলন কি এবং তাতে মেয়েরা অংশ গ্রহণ করেছে কিনা। তাদের মধ্যে বাঙালীত্ব বোধের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। আর দেশ সম্পর্কিত চেতনার চিহ্নমাত্রও নেই।

প্রশ্ন ১৬ ঃ ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের কিভাবে দেখতে চান?

উত্তর ঃ আমি চাই তারা আদর্শবাদী হবে-নিজস্ব সংস্কৃতি, নিজস্ব ভাষা এবং নিজের দেশ সম্পর্কে।

প্রশ্ন ১৭ ঃ ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করবে এমন কোন উপদেশ দিন-

উত্তর ঃ উপদেশে বলা যায়-নিজের দেশকে ভালোবাসো, ভাষাকে ভালোবাসো-তবেই পরিপূর্ণ মানুষ হবে পারবে।

প্রশ্ন ১৮ ঃ জাতির কাছে আপনি কি আশা করেন?

উত্তর ঃ জাতির কাছে আশা ছিল অনেক। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু আমাদের প্রত্যাশ্যা পূরণ হয়নি। আমরা যারা ভাষা আন্দোলনে ছিলাম, দেশের এ রকম পরিস্থিতি কখনো আসা করিনি। আমরা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। অতিবিলাসীতা আমাদেরকে মানায় না, দৃষ্টিকটূ দেখায়-আর তা কাম্যও হতে পারে না।

প্রশ্ন ১৯ ঃ ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সুতরাং ২১ ফেব্রুয়ারি না হয়ে বাংলা মাস ৮ ফাল্গুন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

উত্তর ঃ নিঃসন্দেহে একমত পোষণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার-৬

ডঃ কাজী খালেদা খাতুন

প্রশ্ন ১ ঃ ১৯৫২ সালে আপনার বয়স কত?

উত্তর ঃ ১৩ বছর

প্রশ্ন ২ ঃ ১৯৫২ সালে আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালে কামরুন্নেসা স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলাম।

প্রশ্ন ৩ঃ বর্তমানে আপনার পেশা কি?

উত্তর ঃ ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করে চিকিৎসক হিসেবে কর্তব্য পালন করতে থাকি। বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছি।

প্রশ্ন ৪ ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার প্রথম অনুভূতি কি রকম ছিল?

উত্তর ঃ বয়স কম ছিল। ভালো করে তেমন কিছুই বুঝতাম না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন আপা আমাদেরকে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত কথা-বার্তা বলতেন এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। বলতে গেলে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রথম অনুভূতি এভাবেই আমার মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৫ ঃ ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি, (১) ১৯৪৭-১৯৪৮ এবং (২) ১৯৫২-১৯৫৬- আপনি কোন পর্যায়ে ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলাম।

প্রশ্ন ৬ ঃ কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা অনুষ্ঠিত ভাষা আন্দোলনের সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজকে সম্পৃক্ত করি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ৭ ঃ আপনার সাথে আর কে কে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমার সঙ্গে ছিলেন জুলেখা হক, পারুল, নুরী, হালিমা আমিন (তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের দ্বিতীয় কন্যা) ও আরো কয়েকজন (নাম মনে নেই)।

প্রশ্ন ৮ ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিনের বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ যেহেতু আগেই বলেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আন্দোলনের জন্য আমাদেরকে সংগঠিত করতে আসতেন-তাই পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা স্কুল বাস থেকে নেমে স্কুলের ভিতরে না ঢুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি। কারণ একবার স্কুল ক্যাম্পাসে ঢুকলে বাইরে বের হওয়া মেয়েদের জন্য অনেক কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইয়েরা আমাদের সেখানে নিয়ে যায়। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি আলাদা সভা হয়েছিল। একটা আমতলায় আর একটা মহিলা কমনরুমে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সভায় বক্তৃতা করেন রওশন আরা দুলু আপা এবং স্কুলের ছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সভায় মিছিল নিয়ে এসেম্বলি হলের দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়, আমাদের ছাত্রীদের মিছিলটি যখন পুলিশের বেস্টনি পার হয় তখনই শুরু হয় পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ। আমার চোখ তখন জ্বালা করছিল। মিছিলটি এক সময় ছত্র ভঙ্গ হয়ে যায়। আমাদের অর্থাৎ স্কুলে ছাত্রীদের একটু পেছনে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। আমরা তখন রশিদ বিল্ডিং এর এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষামাণ ছিলাম। ততক্ষণে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেছে। এরপর বাসায় যাওয়াটা আমাদের জন্য কঠিন ব্যাপার ছিল। কারণ রাস্তা চিনতাম না।

প্রশ্ন ৯ ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর যেহেতু স্কুল ছাত্রী ছিলাম তাই পরবর্তী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ২১ ফেব্রুয়ারির নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ উর্দু বদলে আরবি নেয়। আরবি যদিও আমার কাছে কঠিন বিষয় ছিল তবুও প্রতিজ্ঞা করি আরবি পড়বো কিন্তু উর্দু পড়বো না। আবার কলেজে ওঠার পরে ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিল, মিটিং-এর কয়েকবার যোগ দিতে পেরেছি। মেডিকেলে পড়ার সময় এ কাজগুলো সহজেই করতে পেরেছিলাম। এর পরে আমি কখনো বিদেশে যাওয়া ছাড়া ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষা করিনি। আমি আমার প্রেসক্রিপশান পর্যন্ত বাংলায় লিখি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১০ ঃ শহীদদের প্রতি প্রথম কোথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন?

উত্তর ঃ ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির দিন আমি, হালিমা আমিন, নূরী, পারুল ও আরো অনেকে মিলে স্কুল প্রাঙ্গণে একটি শহীদ মিনার তৈরি করি- কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই। এবং সেখানেই শহীদদের উদ্দেশ্যে প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করি। স্কুলের হেড মিস্ট্রেস শহীদ মিনার তৈরির ব্যাপারে উৎসাহ না দিলেও বাধা দেননি।

প্রশ্ন ১১ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য আপনার সামাজিক অবস্থা কতটা সহায়ক ছিল?

উত্তর ঃ সামাজিক অবস্থা অনুকূলে ছিল না। সমাজ ব্যবস্থা ছিল রক্ষণশীল। সেখানে স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ব্যাহত হতো, সেখানে মেয়েদের রাজনীতি অংশগ্রহণ দূরুহ ব্যাপার ছিল।

প্রশ্ন ১২ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য পরিবার থেকে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছেন?

উত্তর ঃ আমি পারিবারিকভাবে উৎসাহ পেয়েছি। যদিও প্রথমে বড় ভাই বয়স কম ছিল বলে বাধা দিত কিন্তু পরবর্তীতে উৎসাহ দিয়েছেন। বাংলা ভাষার বই নিয়ে আমাদের একটি পারিবারিক লাইব্রেরী ছিল। তাই আমার বাংলার প্রতি ভালোবাসার জন্ম সেখান থেকেই।

প্রশ্ন ১৩ঃ ১৯৫২ সালের পরবর্তী ফলাফলগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল কি?

উত্তর ঃ প্রত্যাশা অনুযায়ী এতটুকুই ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া পর্যন্ত। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চাপে পড়ে এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। তারা মনে প্রাণে চায়নি উর্দুর পাশাপাশি বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করুক। তাই সরকারি কাজকর্মে বাংলার প্রচলন ছিল খুবই কম এবং তা হতেও দেয়া হতো না।

প্রশ্ন ১৪ ঃ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ সহায়ক তো বটেই। এ দেশের মানুষের মধ্যে আন্দোলনের জাগরণ এসেছে ভাষা আন্দোলন থেকেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১৫ ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ আমরা যখন ছাত্রী ছিলাম, আমাদের মধ্যে যে দেশাত্মোবোধ কাজ করতো- তা এখনকার ছাত্রীদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ১৬ঃ ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের কিভাবে দেখতে চান?

উত্তর ঃ বাঙালীত্ববোধ বা বাঙালীর প্রকৃত ঐতিহ্য ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাত্রীদের মধ্যে দেখতে চাই।

প্রশ্ন ১৭ ঃ ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করবে এমন কোন উপদেশ দিন-

উত্তর ঃ ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাত্রীরা শ্রেণী বৈষম্য দূর করার জন্য সচেষ্ট হবে।

প্রশ্ন ১৮ ঃ জাতির কাছে আপনি কি আশা করেন?

উত্তর ঃ সত্যিকার অর্থে সম্পূর্ণ শান্তিময় বাংলাদেশ আমার একান্ত চাওয়া। বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদাসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষায় প্রচলন দেখতে চাই। আমার দেশ, আমার মাতৃভূমির চেয়ে বড়- আমার কাছে আর কিছু হতে পারে না। সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি। বিশ্ব কবির উক্তি- "সাত কোটি সন্তানের হে মুক্ত জননী রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।"-এই উক্তি আমরা বাঙালিরা ভুল প্রমাণিত করছি। তিনি বেঁচে থাকলে অনেক গর্বিত হতেন বলে আমার ধারণা। আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা স্বীকৃতি পেয়েছি। মুক্ত জননী আজ গর্বিত জননী। বাঙালী শুধু ডাল ভাতের বাঙালী নয়। বাঙালী মাছ-ভাতের এবং দুধ ভাতের হয়ে বেঁচে থাক। বাঙালীর মেধার স্বীকৃতি দেশে বিদেশে। মেধা বিকাশের জন্য যোগ্য নেতৃত্বেরই একমাত্র প্রয়োজন। আমি গর্বিত বাঙালী, মাথা উঁচু করে চলার মতো প্রাণবন্ত বাঙালী। আমার ভাষায় আমি আনন্দিত, আমার ভাষায় আমি নত। সুজলা সুফলা বাংলা আমার চির চাওয়া, চির পাওয়া।

প্রশ্ন ১৯ঃ ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সুতরাং ২১ ফেব্রুয়ারি না হয়ে বাংলা মাস ৮ ফাল্গুন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

উত্তর ঃ ব্যাপারটা তখনি হলে ভালো হতো। কিন্তু এখন আর একুশবো আর ইংরেজী একুশ বলে মনে হয় না। একুশের সঙ্গে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব মিশে গিয়ে স্পর্শকাতর দিবসে পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার-৭

সারা তৈফুর মাহমুদ

প্রশ্ন ১ঃ ১৯৫২-তে আপনার বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ ১৯ বছর।

প্রশ্ন ২ ঃ ১৯৫২ সালে আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ১ম বর্ষের ছাত্রী ছিলাম।

প্রশ্ন ৩ ঃ বর্তমানে আপনার পেশা কি?

উত্তরঃ দীর্ঘদিন ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলাম। এখন অবসর জীবন যাপন করছি।

প্রশ্ন ৪ ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার প্রথম অনুভূতি কি রকম ছিল?

উত্তর ঃ আমি তখন রংপুরে কারমাইকেল কলেজের ছাত্রী। রাজনৈতিকভাবে তেমন সচেতন ছিলাম না। কিন্তু ১৯৪৮ সালে প্রথম যখন মাওলানা ভাসানী, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ প্রতিবাদ করলেন তখন থেকেই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

প্রশ্ন ৫ ঃ ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি, (১) ১৯৪৭-১৯৪৮ এবং (২) ১৯৫২-১৯৫৬- আপনি কোন পর্যায়ে ছিলেন?

উত্তর ঃ আমি দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলাম।

প্রশ্ন ৬ ঃ কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন?

উত্তর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই দেখি যে, ভাষার প্রশ্নটি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। আমি চামেলি হাউজে থাকতাম, সব দিক থেকেই বৈষম্যের কারণে স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এই বৈষম্যই আমাকে ও আমার সহপাঠীদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। আর এভাবেই ধীরে ধীরে ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ি। তখন মাতৃভাষার দাবিতে পুরো

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ই সোচ্চার ছিল। তখন অনুভব করলাম আমিও ভাষার দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছি। হলের ছেলেরা কাগজও কালি দিয়ে যেতো, আমরা পোস্টার লিখতাম। নাজিমউদ্দিন গদি ছাড়ো, 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি স্লোগান লিখতাম- এভাবেই আন্দোলনের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম।

প্রশ্ন ৭ ঃ আপনার সাথে আর কে কে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমার সাথে হালিমা খাতুন, সাফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার এবং মুসলিম গার্লস স্কুলের কয়েকজন ছাত্রী।

প্রশ্ন ৮ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিনের বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি দিন সকালে মেয়েদের সংগঠিত করার জন্য মুসলিম, গার্লস স্কুলে যাই এবং ছাত্রীদেরকে নিয়ে আসতে চাইলে হেড মিস্ট্রেস বাধা দেন। তখন আমি স্কুলের মাঠে এসেম্বলিতে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্য পাঁচ মিনিট সময় পাই। আমি সেখানে বলেছিলাম, "ভাষা আন্দোলনের কথা তোমরা জান, উর্দু একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এটা যৌক্তিক নয়। আজকে একটা মিটিং হচ্ছে আমতলায়। তোমরা যদি সেখানে যেতে চাও তো আসতে পার।" আমার কথা শুনে আমাদের সঙ্গে প্রায় ২৫-৩০ জন্য ছাত্রী চলে আসে। আমরা ওদেরকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় সমবেত হই। আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা নিয়ে দুটি দল হলো। আমরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে ছিলাম। মেয়েদের দ্বিতীয় যে দলটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আমি সেই দলে ছিলাম। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পর পরই পুলিশ মিছিলের উপর আক্রমণ করে। আমি তাতে আহত হই, আমার পা কেটে যায়। পরে মেডিকেলে যাই এবং নার্সরা পা ড্রেসিং করে দিলে হলে ফিরে আসি।

প্রশ্ন ৯ ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারির পরে আহতদের চিকিৎসার জন্য আমরা চাঁদা তুলতে যেতাম। আমি এবং শামসুন্নাহার আজিমপুর এলাকায় চাঁদা তুলেছি। ঘটনার ১০ দিনের মাথায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। আমি রংপুরে ফিরে যাই। তবে ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে আন্দোলনে সক্রিয় না থাকলেও সচেতন ছিলাম।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১০ ঃ শহীদদের প্রতি প্রথম কোথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন?

উত্তর ঃ ১৯৫৮ সালে ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শহীদ মিনার তৈরি করে সেখানে প্রথম ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

প্রশ্ন ১১ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য আপনার সামাজিক অবস্থা কতটা সহায়ক ছিল?

উত্তর ঃ সামাজিক অবস্থা মোটেই সহায়ক ছিল না। রক্ষণশীলতার যুগে মেয়েদেরকে কতটাই বা স্বাধীনতা দেয়া হতো। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গায় ছেলে সহপাঠীদের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ ছিল-আর তাতেই রক্ষণশীলতার তীব্রতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ১২ ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য পরিবার থেকে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছেন?

উত্তর ঃ বাবা ছিলেন জেলা জজ। তিনি রিটায়ার করার আগেই মারা যান। ক্লাশ নাইনে আমার বিয়ে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার অনেক আগেই। আমার পরিবার শিক্ষিত ছিল। এদিক থেকে পরিবার অতি মাত্রায় সচেতন ছিল। পরিবার বলতে শ্বশুর বাড়িই ছিল আমার সব। সেখান থেকে কোনো বাধা পাইনি।

প্রশ্ন ১৩ঃ ১৯৫২ সালের পরবর্তী ফলাফলগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল কি?

উত্তর ঃ এক কথায় বলতে হলে ছিল। সেটা আমি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলতে পারি। ইতিহাসের ছাত্রী আমি। বৃটিশ শাসনের ২০০ বছর, তারপরে পাকিস্তানের দুঃশাসন। এ সবের ফলে আমাদের সচেতন মনের সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনকেই প্রত্যাশিত করে তুলেছে।

প্রশ্ন ১৪ ঃ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়কছিল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশ। ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার জন্যেই নয় -ভাষাকে উন্নত করতে বা ভাষাকে আন্তর্জাতিক করার জন্যেই নয়-ভাষা আন্দোলন শুধু একটা ভিত্তি-যার পেছনে ছিল এদেশের মানুষের একটু ক্ষোভ-অবিচারের ক্ষোভ, বৈষম্যের ক্ষোভ। আর এই সমস্ত ক্ষোভগুলো থেকে তাদের মধ্যে স্বাধীকারের যে আকাঙ্খা-এই আকঙ্খায় পরবর্তী আন্দোলনগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১৫ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ আজকালকার মেয়েরা অনেক বেশি সচেতন ও স্বাভাবিক। কারণ তাদের সামাজিক, পারিবারিক ও বাইরের পরিবেশ সবকিছুই অনুকূলে। এটার দুটো দিক হচ্ছে-কিছু কিছু সচেতন না আবার অনেকেই সচেতন। আসলে সবাই চায়-সমাজ পরিবর্তন হোক, উন্নত হোক। আর আমিও তা চাই। ছাত্রীরা অনেক সচেতন। তবে এর খারাপ দিকও বিদ্যমান।

প্রশ্ন ১৬ ঃ ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের কিভাবে দেখতে চান?

উত্তর ঃ তাদের মধ্যে একটা মূল্যবোধ থাকবে-কতগুলো শাশ্বত মূল্যবোধ আছে- যেগুলোর ভালো ও মন্দ দুটো দিকই বিদ্যমান। তবে ভালো মূল্যবোধকে দেশের সব ক্ষেত্রেই ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রশ্ন ১৭ঃ ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করবে এমন কোন উপদেশ দিন-

উত্তর ঃ মেয়েদেরকে লেখাপড়া শিখতে হবে। সব মেয়েদেরকে ছেলেদের সমান করে দেখতে হবে। এটা পরিবারের দায়িত্ব। সমান অধিকার নিশ্চিত করলে মেয়েদের মধ্যে অনেক বেশি পরিবর্তন আসবে। আমাদের এখনো বহু বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা ছাত্রী সনাতন মতগুলো নিয়েই বসে আছে। তাই পরিবর্তন দরকার। তবে সেই পরিবর্তন যেন ভালোর দিকে যায়। সমাজটা ভালো হোক। জাতীয়তাবোধ আর আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ জেগে ওঠুক। যেখানে যেটা ভালো হবে সেখানে সেটা গ্রহণ করতে হবে। তাহলে সমাজটা পরিবর্তিত হবে, উন্নত হবে। সমাজের পুরুষেরা যে রকম দায়িত্ব পালন করছে- সে রকম দায়িত্ব মেয়েদেরও পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ১৮ঃ জাতির কাছে আপনি কি আশা করেন?

উত্তর ঃ জাতির কাছে যে কোনো দেশের মানুষ চায়- তার দেশটা সুন্দর হোক, দেশের ভবিষ্যত ভালো হোক, সমস্যাগুলো দূর হোক, আবার বলি মূল্যবোধটা ফিরে আসুক। তেমনিভাবে আমার প্রত্যাশা হচ্ছে পরিবর্তন হোক-পরিবর্তনগুলো ভালোর দিকে হোক।

প্রশ্ন ১৯ঃ ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সুতরাং ২১ ফেব্রুয়ারি না হয়ে বাংলা মাস ৮ ফাল্গুন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

উত্তরঃ ৮ ফাল্গুন হওয়া উচিত ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার-৮

জুলেখা হক (হাবিব)

প্রশ্ন ১ঃ ১৯৫২-তে আপনার বয়স কত ছিল?

উত্তর ঃ ১৪ বছর।

প্রশ্ন ২ ঃ ১৯৫২ সালে আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

উত্তর ঃ কামরুন্নেসা স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলাম।

প্রশ্ন ৩ ঃ বর্তমানে আপনার পেশা কি?

উত্তর ঃ ইডেল কলেজে শিক্ষকতা করতাম। এখন অবসর জীবনের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছি।

প্রশ্ন ৪ ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার প্রথম অনুভূতি কি রকম ছিল?

উত্তর ঃ যখন এই কথাগুলো প্রচার হলো যে, বাংলা লেখা যাবে না, আরবি হরফে বাংলা লিখতে হবে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, বাংলায় কথা পর্যন্ত বলা যাবে না-এই ছোট বাক্যগুলো আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপারা যখন স্কুলে এসে বলতেন তখন ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে তা আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বাংলায় লিখতে, বলতে, পড়তে পারব না- এ ব্যাপারটি তখন আমার কাছে ছিল মর্মস্পর্শী।

প্রশ্ন ৫ ঃ ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি, (১) ১৯৪৭-১৯৪৮ এবং (২) ১৯৫২-১৯৫৬- আপনি কোন পর্যায়ে ছিলেন?

উত্তর ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলাম।

প্রশ্ন ৬ ঃ কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন?

উত্তর ঃ ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে অংশ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইয়েরা স্কুল গেট থেকে আমাদের নিয়ে আসে। ঐ সমাবেশেই

Dhaka University Institutional Repository

শুনি ২১ ফেব্রুয়ারিতে আর একটি বড় সভা আহ্বান করা হয়েছে। এভাবেই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ৭ ঃ আপনার সাথে আর কে কে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর ঃ আমার সঙ্গে ছিলেন তাহমিনা, পারুল ও আরো অনেকে।

প্রশ্ন ৮ ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিনের বর্ণনা করুন?

উত্তর ঃ যেহেতু আমার বয়স খুবই কম ছিল তাই আমার কর্মকাণ্ডও ততো ব্যাপক ছিল না। তবে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথম আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। আসলে ২১ ফেব্রুয়ারির ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য স্কুলের অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় যোগ দিই এবং সবার সঙ্গে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মিছিলে যাই। পরবর্তীতে পুলিশ মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

প্রশ্ন ৯ ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর ঃ আসলে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির নৃশংস ঘটনার প্রতিক্রিয়া বলে, লিখে বুঝানো সম্ভব না। কারণ এ ঘটনাটি আমাদের মর্মমূলে ভীষণ ভাবে আঘাত হেনেছে।

প্রশ্ন ১০ঃ শহীদদের প্রতি প্রথম কোথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন?

উত্তর ঃ আমরা তখন বয়সে ছোট। তাই কোন পরিকল্পনা ছাড়াই আমরা কয়েকজন মিলে স্কুলে গান শেখার পর একটি শহীদ মিনার তৈরি করি। এটা করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধা হয়ে যায়। ঐ শহীদ মিনারেই প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করি। পরদিন স্কুলে এসে শহীদ মিনারটি দেখি। কিন্তু একদিন পড়ে সেটাকে আর দেখিনি।

প্রশ্ন ১১ ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য আপনার সামাজিক অবস্থা কতটা সহায়ক ছিল?

উত্তর ঃ সামাজিক অবস্থা অনুকূলে ছিল না। সে সময়ের রক্ষণশীল পরিবেশ আমাদেরকে আড়ষ্ট করে রেখেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১২ঃ আন্দোলনের জন্য পরিবার থেকে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছিলেন?

উত্তর ঃ পরিবার থেকে উৎসাহ পেতাম। কারণ বাবা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ঐ সময়ে আমাদের বাড়িতে সৈয়দ মুজতবা আলী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আসতেন এবং ভাষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা আমি শুনতাম। বয়সে ছোট ছিলাম বলে পরিবার থেকে আন্দোলনে যাওয়ার ব্যাপারে তেমন কোনো বাঁধা পাইনি। আন্দোলনে যোগদান করেছি-এটা জেনেও পরিবারের পক্ষ থেকে আমাকে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি।

প্রশ্ন ১৩ ঃ ১৯৫২ সালের পরবর্তী ফলাফলগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল কি?

উত্তরা ঃ প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল বলেই তো ১৯৫৬ সালে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

প্রশ্ন ১৪ ঃ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ছিল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ আমরা পাকিস্তানী রাষ্ট্রের অধিবাসী হতে পারি কিন্তু আমরা যে বাঙালী, আমাদের ঐতিহ্য যে স্বতন্ত্র- মোটকথা বাঙালীত্বকে আলাদা করাই ছিল ভাষা আন্দোলন। আমাদের একটা আলাদা পরিচয় আছে। আমরা বাঙালী- এই ধারণার সৃষ্টি হয় ভাষা আন্দোলন থেকেই। আমাদের বাঙালীর সে স্বত্ত্বাকে অবলম্বন করেই পরবর্তীতে বাঙালীর সকল রকম অন্যায় ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এবং এই পথ ধরেই স্বাধিকার আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ১৫ ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীরা আত্মকেন্দ্রিক। বাঙালী সংস্কৃতি কি তা তারা জানেনা। আমরা যখন ছাত্রী ছিলাম, আমাদের বিনোদনের মাধ্যম ছিল বই-মূল্যবোধ জাতীয় কথাবার্তা আমরা বই থেকে শিখতাম। এখনকার ছাত্রীদের বিনোদন হচ্ছে টেলিভিশন-তারা কি করে মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে।

প্রশ্ন ১৬ ঃ ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের কিভাবে দেখতে চান?

উত্তর ঃ সৎ, নির্ভীক ও দেশপ্রেমিক হিসাবে দেখতে চাই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ১৭ ঃ ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করবে এমন কোন উপদেশ দিন-

উত্তর ঃ তারা পড়ালেখা করুক। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা থাকবে কিন্তু তারা যেন ছাত্রী অবস্থায় রাজনীতি না করে। কারণ এখনকার রাজনীতি ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষা জীবনে ছাত্র রাজনীতিকে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আমি বলব- বই, বই, বই পড়; নিজের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করো। বই মানুষের মন এবং চোখ উভয়কেই খুলে দেয়। তোমরা যেটাই শিখবে ভালো করে এবং সঠিক শিখবে। তুমি যদি নিজের ভাষাকে ভালো করে না শিখো তবে অন্যেরটাও শিখতে পারবে না।

প্রশ্ন ১৮ ঃ জাতির কাছে আপনি কি আশা করেন?

উত্তর ঃ যে উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম সে উদ্দেশ্যের সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে। এতো বড়ো একটা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে ফসল আমরা ঘরে আনলাম-আমরা তা হেলায় ফেলে দিয়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তীতে যে নেতারা আমাদের দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে তারা এ জাতিকে বিশ্বের কাছে ঘৃণ্য জাতি হিসেবে তুলে ধরেছে। ভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ-এতো বড়ো ঘটনা যে জাতির ইতিহাসে আছে তারা যেন নিজেদের আর ছোট না করে।

প্রশ্ন ১৯ ঃ ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সুতরাং ২১ ফেব্রুয়ারি না হয়ে বাংলা মাস ৮ ফাল্গুন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

উত্তর ঃ আসলে এটা অনেক আগের ব্যাপার-এটা তখন হলেই ভালো হতো।

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যায়ন ঃ

এই অধ্যায়ে সেই সব ছাত্র-নেত্রীদের সাক্ষাৎকার নিয়েছি যারা সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে তাদের বয়স হয়েছে, স্মরণশক্তি কমে গিয়েছে, অনেকেই শারীরিকভাবে অসুস্থ। কিন্তু তাদের নিয়ে গবেষণা কাজ করছি শুনে প্রত্যেকেই প্রচুর পরিমাণে উদ্দীপিত এবং উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়েছেন আমাকে অনেক সময় নিয়ে তাদের সাথে কথা বলে, সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয়েছে। তাদের সহযোগিতার ফলে আমার এই গবেষণা কাজটি সার্থকতার মুখ দেখেছেন তবে, কেউ কেউ আমাকে সহায়তা তো করেননি বরং আমাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। অথচ আমি মনে করি তাদের সহযোগিতা, বক্তব্য এবং সাক্ষাৎকার আমার এই কাজটিকে আরও সমৃদ্ধ করতো। এদেরই একজন হলেন অধ্যাপক সানজিদা খাতুন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং 'ছায়ানট'-একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের 'নির্বাহী পরিচালক'। বহুবার তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলাম যে, একদিন উনি রাজী হবেন আমাকে একটি সাক্ষাৎকার দিতে। কিন্তু আমি ব্যর্থ যে তাঁর বক্তব্যটি নিতে পারিনি। উনি একজন সক্রিয় ছাত্রী নেত্রী ছিলেন, তাঁর বক্তব্য আমার গবেষণা কাজটিকে আরও সমৃদ্ধ করতো, তবে আমার বিশ্বাস আমি সুষ্ঠভাবেই আমার দায়িত্ব পালন করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী (যাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি) ছাত্রীদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ঃ

ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এমন কিছু ছাত্রী নেত্রী যারা বিভিন্ন কারণে সাক্ষাৎ প্রদানে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন কিংবা আমি যাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি, তবে তাদের সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হলো। আমার বিশ্বাস এই তথ্যাবলী আমার গবেষণা প্রতিবেদনকে আরো সমৃদ্ধ করবে। এরা ভাষা আন্দোলনে তুখোর কর্মী ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন পর্দার অন্তরালে। কিন্তু এদের সম্পর্কে জানা আমাদের কর্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

নাদেরা বেগম

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের একজন একনিষ্ঠ কর্মি নাদেরা বেগম। তিনি এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এম. এ. ক্লাশের ছাত্রী ছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই তিনি ঢাকায় আসেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে তার ছোট মনকে ভাবিয়ে তোলে। ভাই মুনীর চৌধুরীর কাছ থেকে বৈষম্যের স্বাভাবিক বোঝাপড়া অন্নহীনতা, বস্ত্রহীনতা, বাসহীনতা ইত্যাদি প্রশ্নগুলো সম্পর্কে অবগত হতেন। আর তখন থেকেই তিনি বুঝেছিলেন লড়াইয়ে নামতে হবে, সবাইকে সংঘবদ্ধ করে তুলতে হবে। বিশেষ করে ছাত্রীদেরকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,-

"ছাত্রী সংঘকে গড়ে তোলার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাকে। মেয়েদের বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের সচেতন করে তুলতে হবে সমাজ সম্পর্কে। ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, সমাজে সকলের মাথা তুলে দাঁড়ানোর অধিকার সব আদায় করে নিতে হবে। "গড়ে তুলতে হবে সংগঠন"। (তথ্যসূত্রঃ ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি,১৯৯৮)।

১৯৪৮ সালে যখন ভাষার প্রশ্নটি বাঙালিদের আন্দোলিত করতে থাকে তখন নাদেরা বেগমও এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নিতে ভুল করেননি। তিনি ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ভাষার মিছিলে অংশগ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে আরো ৪০ জন ছাত্রীও ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,-

"জানি না সন, তারিখ, স্থান এসব কিছু কড়াক্রান্তি হিসাবে নির্ভুল হবে কি না। ডায়রী আমি রাখিনি, সন তারিখ দেয়ার ব্যাপারে আমি তেমন দর নই। কিন্তু কিছু জিনিস আমার মনের পর্দায় ভালোই ছাপ রেখে গেছে। আমি মনে করি কিছু ছেলে বন্ধুদেরও হয়তো ব্যাপারটা মনে থাকতে পারে। আর থাকতে পারে আজ যাদের ৭০/৭৫ তাদের। ৪৮ সালের শেষের দিকে ভাষা আন্দোলনের ছোটখাটো একটি মিছিলের উপর যে প্রথম লাঠিচার্জ হয় তার পুরাভাগে ছিলাম আমরা জন ৪০ শেক মেয়ে। মেয়েদের হয়ে এ অহংকারটুকু করার লোভ সামলাতে পারলাম না।" (তথ্যসূত্রঃ ভোরের কাগজ, ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি,১৯৯৮)।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি সশরীরে অংশ নেননি। আর এ কারণেই তিনি নিজে মনে করেন, ভাষা আন্দোলনে তার কোনো ভূমিকা ছিল না। কারণ দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাষা আন্দোলন শুরুর আগেই তিনি গ্রেফতার হন। তথাপি ১৯৫২ সালের যুগান্তকারী ভাষা আন্দোলনের পরিণতি ছিল এর পূর্বের খণ্ড খণ্ড আন্দোলনের চূড়ান্ত ফল। যার প্রায় সব ক্ষেত্রেই নাদেরা বেগমের সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। তাই বলা যায়, ভাষা আন্দোলনে নাদেরা বেগমের অবদান ছিল নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী।

Dhaka University Institutional Repository

শামসুন্নাহার

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নাম শামসুন্নাহার। ১৯৫২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রাক্তন স্পীকার আবদুর ওহাবের কন্যা। স্বভাব, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুতেই তার রক্ষণশীলতার পরিচয় বহন করতো। তিনি বোরখা পড়তেন।

তার সামাজিক অবস্থা এবং তিনি নিজেই রক্ষণশীলতার আড়ালে থেকে বাঙালীর জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে সবকিছুকে উপেক্ষা করে ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও মিছিলে যোগদান করেন। কবে, কখন, প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন- তা জানা যায়নি। তবে ১৯৫২ সারের ফেব্রুয়ারির শুরু থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার যে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল শামসুন্নাহার বোরখার আবরণে বন্দি থেকেও তাতে অংশগ্রহণ করেন। মেধাবী ও পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে পরিচিত শামসুন্নাহারের অংশগ্রহণ সবাইকে হতবাক করে তোলে। তিনি এ সময় তার সহপাঠীদের নিয়ে প্রায় সবগুলো ছাত্র-ছাত্রী সভা, মিছিল ও পিকেটিং-এ অংশহণ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই-এ কথাটি এতো জোরে উচ্চারণ করেছিলেন যে, তার পর্দার আবরণ মুছে যায়।

১৯৫২ সালেব ফেব্রয়ারিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি বাস্তবায়ন করার জন্য ছাত্রীদের হলে চামেলি হাউজে যে ঘরোয়া সভা বা বেঠক হতো - তিনি সেখানে জোরালোভাবে বক্তৃতা রাখতেন। তার কর্মকাণ্ড দেখে সে সময়ে আড়ষ্টতা ভেঙ্গে অনেক ছাত্রীই তার সঙ্গে যোগ দেন এবং আন্দোলনে শরীক হন।

১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত দিনে তিনি তার অন্যান্য ছাত্রী সুফিয়া ইব্রাহিম, সাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু প্রমুখের সঙ্গে আমতলার সমাবেশে মিলিত হন। এবং অন্যান্যদের সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের সংগঠিত করে আবার আমতলায় ফিরে আসেন।

কলাভবনের আমতলার সমাবেশ থেকে পরবর্তী কর্মসূচি স্বরূপ ২১ ফেব্রুয়ারির ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনি তাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তার দলের মিছিলটি

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশের বেস্টনি পার হলে হঠাৎ করেই পুলিশের অতর্কিত হামলায় সবাই দিশেহারা হয়ে পড়েন। এ সময় তিনি এবং সুফিয়া ইব্রাহিম কাঁটাতারের বেড়া ডিঙ্গিয়ে হলের প্রভোস্ট ডঃ গণির বাসায় আশ্রয় নেন। কাঁটাতারের বেড়ার আঘাতে তিনি আহতও হন।

পরবর্তীতে ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদদের উদ্দেশ্যে যে মিছিল হয় তাতে শামসুন্নাহার অংশগ্রহণ করেন। আবার ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করেন। শামসুন্নাহার ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত মিটিং মিছিল, সভা, সমাবেশেও যোগ দেন।

শামসুন্নাহার এভাবেই সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের প্রাণের দাবি তথা ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই বলা যায়, শামসুন্নাহার আহসান আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের প্রেক্ষাপটে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী ও তেজস্বী নারী।

Dhaka University Institutional Repository

সুফিয়া খান

সুফিয়া খান ভাষা আন্দোলনে একজন অন্যতম কর্মি। তিনিই একমাত্র ছাত্রী যে, ভাষা আন্দোলনের দুটি পর্যায়ে (১৯৪৮-১৯৫২) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হন। এ সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজেকে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন।

ভাষা আন্দোলনকে সফল করার জন্য চামেলি হাউজের অন্যান্য ছাত্রীদেবকে উৎসাহিত করতেন এবং বিভিন্ন মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময় নাদেরা বেগম তার সঙ্গী ছিলেন। তারা মুসলিম গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা স্কুল, বাংলা বাজার গার্লস স্কুল এবং ইডেন কলেজের ছাত্রীদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য সংগঠিত করতেন। ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে ভাষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের যে মিছিলটি বের হয় তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলে পুলিশের হামলায় তিনি আহত এবং গ্রেফতার হন। অবশ্য পরে তাদেরকে ছেড়ে দেয়। এ সময় তিনি অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে পোস্টার লিখতেন এবং তা বিলি করতেন।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সুফিয়া খান ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনকে সফল করার জন্য তিনি আমতলায় আসেন। কিন্তু ততক্ষণে মিছিল বের হয়ে যায়। এরপর তিনি চামেলি হাউজে চলে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর ছাত্রীদের অংশগ্রহণ অনেক বেড়ে যায়। আমরা আন্দোলনে আহতদের জন্য চাঁদা তোলার কাজে নিয়োজিত হই এবং অন্যান্য ছাত্রীদেরকেও উদ্বুদ্ধ করি। ২১ ফেব্রুয়ারির পরে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত রাজপথে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে সভা সমাবেশ ও মিছিল হয়েছিল সেগুলোতে তিনি যোগদান করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনকে সফল করার জন্য সুফিয়া খান এভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

কায়সার সিদ্দিকী

কায়সার সিদ্দিকী ১৯৫২ সালেই প্রথম ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র হল চামেলি হাউজে থাকতেন এবং এখানকার নেত্রী শাফিয়া খাতুনের অনুপ্রেরণায় ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কায়সার সিদ্দিকী নিজেই উল্লেখ করেন–

"বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন উত্তপ্ত আবহাওয়া বিরাজ করছিল। ক্লাস বাদ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায়ই য়াংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালন করছিলেন। আমরাও তাদের সঙ্গে হাত মিলালাম। প্রায়ই মিছিল বের হত। সে মিছিলে আমরা শরীক হতাম। মিছিল করে আমরা শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের বের করে নিয়ে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' উর্দু হরফে বাংলা লেখা চলবে না ইত্যাদি স্লোগান দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বিশ্বরিদ্যালয়ে ফিরে আসতাম। (তথ্যসূত্রঃ বাহান্নর ভাষা কন্যা, সম্পদনা-তুষার আবদুল্লাহ, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৩)।

প্রস্তাবিত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির দিনের আন্দোলন কর্মসূচিকে পরিচালনা করার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই অর্থ সংগ্রহের জন্য কায়সার সিদ্দিকী তার বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে ব্যাজ বিক্রি করেছেন। আবার তিনি অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে পোস্টার ও ফেস্টুন তৈরি করেছেন এবং সেগুলো ২১ ফেব্রুয়ারির দিন সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দেওয়ালে লাগানো হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের পর আন্দোলনকারী আহতদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কায়সার সিদ্দিকী অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন অফিস, দোকান ও মানুষের বাসায় গিয়ে চাঁদা তুলেছিলেন। এভাবেই কায়সার সিদ্দিকী ভাষা আন্দোলন সফল করার জন্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

গুলে ফেরদৌস

ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মি গুলে ফেরদৌস ১৯৫২ সালে ইডেন কলেজের ছাত্রী ছিলেন। তিনি ইডেন কলেজের আবাসিক হোস্টেলে থাকতেন। হোস্টেলের অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে তিনিও ভাষা আন্দোলনে উৎসুক হয়ে ওঠেন। তিনি ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য বিভিন্ন সভা, সমাবেশ ও মিছিলে যোগদান করেন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির দিনের কথা বর্ণনা করতে দিয়ে গুলে ফেরদৌস বলেন,-
"ইডেনের মেয়েরা তখন প্রায় সবাই ক্লাশে। তবুও আমরা জনাবিশেক মেয়ে দৌড়ে রাস্তায় নেমে সোজা এসেম্বলির দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু মাঝপথে আমাদের লক্ষ্য করে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলো। আমি ছিলাম দ্বিতীয় নম্বরে, সোজা চোখে এসে লাগলো বিষাক্ত কালো ধোঁয়া।" (তথ্যসূত্রঃ বাহান্নর ভাষা কন্যা, সম্পাদক-তুষার আবদুল্লাহ, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, পৃষ্ঠা-৪৩)।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পরও ভাষা আন্দোলনের জন্য বিভিন্ন সভা, সমাবেশ, মিটিং, মিছিল চলতে থাকে। গুলে ফেরদৌস এসব সভা, সমাবেশ, মিটিং, মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন, স্লোগান দিতেন এবং মাঝে মাঝে বক্তৃতাও করতেন। এছাড়াও গুলে ফেরদৌস ইডেন কলেজের ছাত্রীদের বিশেষ করে হোস্টেলের ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য রাজপথে নেমে পড়েন। শুধু তাই নয়, আন্দোলনরত ছাত্রদেরকেও তিনি বিভিন্ন ভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন।

Dhaka University Institutional Repository

চেমন আরা

ভাষা আন্দোলনে যেসব ছাত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে চেমন আরা ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি ১৯৫২ সালে ইডেন কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন তমুদ্দিন মজলিসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৯ সালে বাংলা ভাষাকে আরবি হরফে লেখার জন্য পাকিস্তান সরকার বিরোধী যে আন্দোলন হয়, চেমন আরা তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করনে। ভাষার আন্দোলনের জন্য এ সময় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ ও মিছিলেও তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ইডেন কলেজে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মিছিল, সভা, সমাবেশে চেমন আরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, বক্তব্য দিয়েছেন এবং সভাপতিত্ব করেছেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ১৪৪ ধারা ভাষার জন্য তিনি ইডেন কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে আমতলায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করনে।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার প্রতিবাদে শহীদ বরকতের রক্তমাখা শার্ট নিয়ে ২২ ফেব্রুয়ারিতে যে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়, সেই মিছিলে চেমন আরা অংশগ্রহণ করেন। চেমন আরা এভাবেই ভাষা আন্দোলনের উত্তাল ও গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে সক্রিয় হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দা হালিমা রহমান

আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে যে গর্বে আমরা গর্বিত হই তার মূলে রয়েছে ভাষা আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে অনেকগুলো নাম জড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে সৈয়দা হালিমা রহমান একজন। তিনি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামের খাস্তগির স্কুলের মেট্রিক পরিক্ষার্থী ছিলেন এবং ঐ স্কুলের হোস্টেলেই থাকতেন।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির দিন সৈয়দা হালিমা রহমান হোস্টেলে বসেই পড়া করছিলেন। তার ভাষায়-

"আমরা সকলেই পরীক্ষার জন্য পড়া মুখস্ত করছি, এমন সময় কে যেন এসে বললো, ঢাকায় গুলি হয়েছে। ভাষার দাবিতে আন্দোলন করতে শহীদ হয়েছে অনেক ছাত্র। শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম। আপাদমস্তক শিউরে ওঠলো। বিশ্বাস হলো না। স্বাধীন মাতৃভাষার দাবিতে ছাত্ররা গুলি খেল? কেমন পাকিস্তান পেলাম? মাতৃভাষার অধিকার চাইতে গিয়ে গুলি খেতে হয়। তবে কি আমরা সত্যিকারের স্বাধীনতা পাইনি?" (তথ্যসূত্র ঃ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, দৈনিক ইত্তেফাক)।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ঘটনায় প্রতিবাদ স্বরূপ একটি মিছিল করার সিদ্ধান্ত হয়। হোস্টেলের কড়া পাহারা ডিঙ্গিয়ে হালিমা রহমান ও তার অন্যান্য সহপাঠীরা রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। দুজন দুজন করে মিছিল করা হয়। তার ভাষায়-

"আমাদের কণ্ঠে স্লোগান রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, নূরুল আমীনের বিচার চাই"। (তথ্যসূত্র ঃ প্রাগুক্ত) এভাবেই তারা মিছিল করতে করতে পুরো শহর প্রদক্ষিণ করে লালবাগের মাঠে সমবেত হন। এরপর ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যারা গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে সেখানে একটি সভা হয়। সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। তিনি এখানে বলেছিলেন,-

"আমার ভাষার অধিকার থাকবে না, মায়ের সম্মান থাকবে না, আমার ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা যাবে না- এ কেমন স্বাধীনতা? আমাদের অন্ধকারে রেখে দেশের পুরা ক্রিয়াকাণ্ড থেকে আলাদা করে একটি দুর্বল জাতিতে পরিণত করাই উদ্দেশ্য? এই-ভাবে একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত সফল করতে জাতির গর্ব ছাত্রসমাজকে হত্যা করা হয়েছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই করতে হবে।" (তথ্যসূত্র ঃ প্রাগুক্ত)।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর পুলিশ হালিমা রহমানকে ধরার জন্য ঘোরাফেরা করলে হেড মিস্ট্রেস তাকে হল ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

সেয়দা হালিমা রহমান ১৯৫৩ সালে ঢাকার ইডেন কলেজের আই. এ. ক্লাশে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ফেব্রুয়ারির মিছিলে এবং বিভিন্ন জায়গার প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণ করেন। ঢাকার আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিতে পেরে তিনি গর্ববোধ করতেন। ছাত্র-নেতাদের প্রতিটি আদেশ উপদেশ তিনি সম্মানের সঙ্গে মেনে নিতেন। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিন। এই দিনে বাংলা ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঢাকা কলেজ মাঠে একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয়। শহীদ মিনারটি গড়ার কাজে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তার ভাষায়-

"আমাদের ঘিরে ছাত্ররা পাহারা দিয়ে রেখেছিল। কেউ কেউ ইট, বালি কাদা এসব যোগান দিচ্ছিল। ক'জন মিলে আমরা ইট গাঁথলাম। তখন ছেলেরা মেয়েদের খুব সমীহ করতো এবং বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখেই চলতো। মনে আছে আমি, সুফিয়া, আশেফা, কানিজ ফাতেমা, লাইলা, রেজিয়া, সেলিমা, সাদেকাসহ আমরা চরম উৎসাহে শহীদ মিনার গড়েছিলাম। যখন শহীদ মিনার প্রায় শেষ, কাঁদা দিয়ে মিনারটাকে মসৃণ করছি, হঠাৎ তখন ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ, মিসেস ফজিলাতুন্নেসা খবর পেয়ে সেখানে ছুটে এলেন। আমাদেরকে খুব শাসালেন, আমরা বকাবকি হজম করেও কাজ শেষ করলাম।" তারপর শহীদ মিনারের উপর ফুল রেখে মোনাজাত করলাম। (তথ্যসূত ঃ প্রাগুক্ত)। সৈয়দা হালিমা রহমান এভাবেই ভাষা আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিশেষ করে ছাত্রীদের সচিত্র প্রতিবেদন

Dhaka University Institutional Repository

৩০ জানুয়ারি, ১৯৫২ ঃ রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনতার মিছিলের একাংশের চিত্র।

ইত্তেফাক

THE ITTEFAQ

নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসভঙ্গে বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ পূর্ববঙ্গ

উর্দু নয়-বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে

সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ The Weekly Ittefaq, 10 February, 1952

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে প্রতিবাদ দিবসে ঢাকায় ছাত্রীদের শোভাযাত্রা।

Dhaka University Institutional Repository

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে প্রতিবাদ দিবসে ঢাকায় ছাত্রীদের শোভাযাত্রা। ছবি ঃ রফিকুল ইসলাম।

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে প্রতিবাদ দিবসে ঢাকায় ছাত্রীদের শোভাযাত্রা। ছবি ঃ রফিকুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে প্রতিবাদ দিবসে ছাত্রীদের শোভাযাত্রা। ছবি ঃ রফিকুল ইসলাম।

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ সালে প্রতিবাদ দিবসে ছাত্রীদের শোভাযাত্রা। ছবি ঃ রফিকুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ঃ ছাত্রীদের প্রভাতফেরি। ছবি-রফিকুল ইসলাম।

১৯৫২, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় ছাত্র-ছাত্রীদের জমায়েত। ছবিঃ রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি শোভাযাত্রা ঢাকার রাজপথ অতিক্রম করছে। মুখে তাদের ভাষা শহীদের স্মরণে ভাষা আন্দোলনের স্লোগান ।

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রীদের একটি শোভাযাত্রা ঢাকার রাজপথ অতিক্রম করছে। হাতে তাদের ভাষা শহীদের স্মরণে ভাষা আন্দোলনের স্লোগান সমৃদ্ধ পোস্টার ও প্লাকার্ড।

ছবিদ্বয়ঃ রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

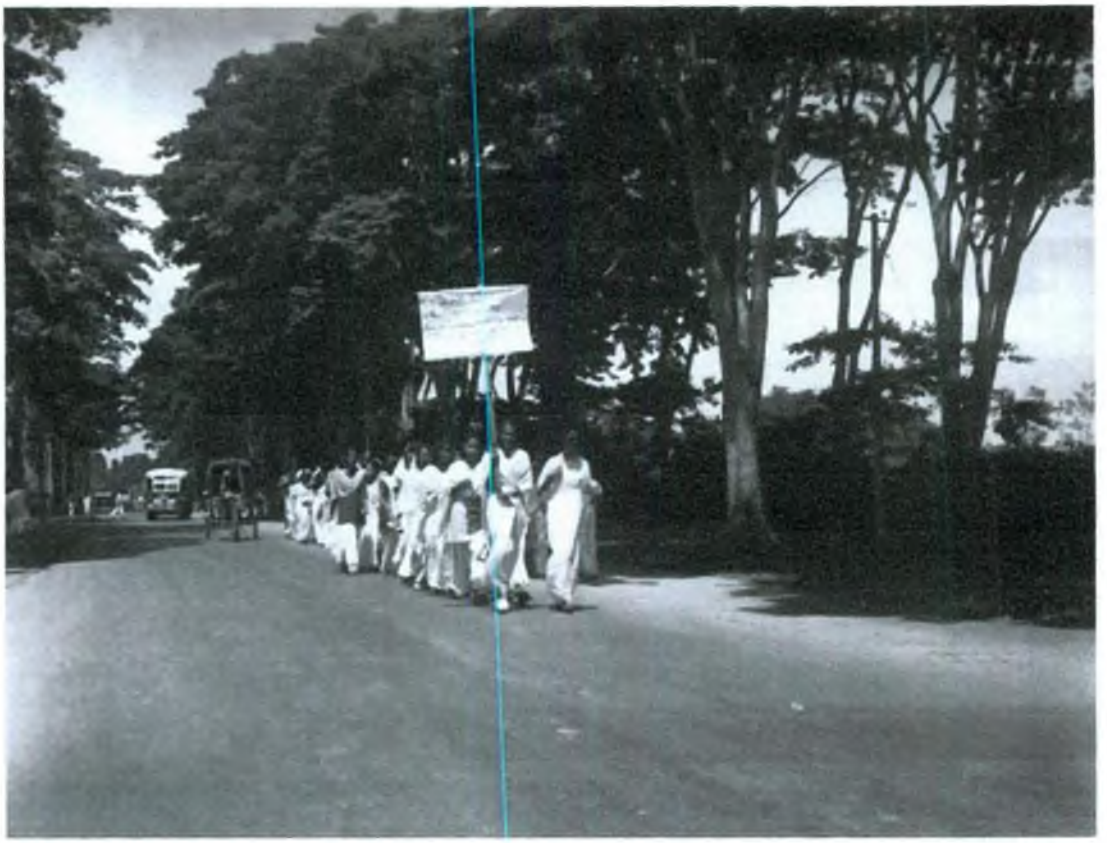

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের একটি শোভাযাত্র।

436748

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারিতে আজিমপুর কবরস্থানে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদন।

ছবিদ্বয়ঃ রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারিতে পুরাতন ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গনে ঢাকা কলেজের ছাত্র ও ইডেন কলেজের ছাত্রীদের শহীদ মিনার নির্মাণ। ইডেনে কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস ফজিলাতুন্নেসা জোহা, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শামসুজ্জামান খান এবং ঢাকা কলেজের প্রফেসর আহসান আহমদ আশক এর বাঁধা প্রদান। ছবিদ্বয়ঃ রফিকুল ইসলাম

১৯৫৫, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ স্কুল ছাত্রীদের শোভাযাত্রা। ছবি ঃ রফিকুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আজিমপুর কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ কামরুন্নাহার স্কুল প্রাঙ্গণে ছাত্রীদের নির্মিত শহীদ মিনার।

আলোকচিত্রঃ রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ আজিমপুর কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন।

১৯৫৩, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ কামরুন্নাহার স্কুল প্রাঙ্গণে ছাত্রীদের নির্মিত শহীদ মিনার।

ছবিদ্বয়ঃ রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তথ্য বিশ্লেষণ, সুপারিশমালা, মূল্যায়ন ও উপসংহার

ভূমিকা ঃ

ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য। এ আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৫৬ সালে স্বীকৃতি পাওয়ার মাধ্যমে স্বীকৃত হলেও এর প্রসার ও প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের ভূমিকা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা অনেক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়েছেন। বিশেষ করে পুরুষ শাসিত সমাজে রাজনীতিতে ও আন্দোলনে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াটি হয়ে দাঁড়ায় অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপারে। তবে এসব ক্ষেত্রে যদিও ছাত্রীদের অংশ গ্রহণের অনেক সুযোগ ও ক্ষেত্র আছে তবুও তারা প্রতিনিয়তই উপেক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু ছাত্রীদের এসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না থাকলে আমি মনে করি দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হবে না। তাই আমার গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীনি ছাত্রীদের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে কিছু সুপারিশ তুলে ধরলাম।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা-

☐ **প্রথমত ঃ**

সেই সময়ে সামাজিক সীমাবদ্ধতায় ছাত্রীদের প্রধান সমস্যা ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে ছাত্র ছাত্রীদের আলাদা করে রাখা হতো-কথা বলার অনুমতি পর্যন্ত ছিল না। তথ্যাপি কোন ছাত্রী কোন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন হতো। এবং বিনা অনুমতিতে কেউ কথা বললে ১০ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হতো। শিক্ষকরা কমনরুম থেকে মেয়েদের ক্লাশে যাওয়ার সময় ডেকে নিয়ে যেতেন। এরকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রীদের পক্ষে রাজনৈতিক ও আন্দোলনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা দুরূহ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপার হয়ে ওঠে। আবার সেই সময় স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলোতেই কড়াকড়ি নিয়মকানুনের জন্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ সহজ ছিল না।

☐ **দ্বিতীয়ত ঃ**

তৎকালে পারিবারিক অবস্থা ছিল রক্ষণশীলতায় ঘেরা। পরিবার থেকে খুব কম ছাত্রীকেই আন্দোলনে উৎসাহিত করা হতো। পর্দাপ্রথা ও রক্ষণশীলতার আড়ষ্টতা ছাত্রীদেরকে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তাই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বেশিরভাগ ছাত্রীই এ বাঁধাকে অতিক্রম করতে পারেনি। অনেক ছাত্রীই এমন পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের চিন্তা ভাবনাতেও সীমাবদ্ধতা বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা জেনে বুঝে হোস্টেলের মতো জায়গায় থেকেও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি।

☐ **তৃতীয়ত ঃ**

পুরুষ নারীর বৈষম্যতাও তখনকার প্রেক্ষাপটে আর একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। অনেকটা চিরাচরিত প্রথার মতো-সামাজিক ব্যবস্থার আদলেই তৈরি হয়। তখন ভাবা হতো যে কাজ ছেলে দিয়ে সম্ভব সে কাজ মেয়েদের দিয়ে সম্ভব নয়, বিশেষ করে রাজনীতিতে ও আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। এমন দৃষ্টিকোণ থেকেই ছাত্রীরা অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল।

☐ **চতুর্থত ঃ**

ভাষা আন্দোলন ছিল শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভাষা আন্দোলনে অন্যান্য নারীদের তুলনায় ছাত্রীদের অংশগ্রহণই বেশি ছিল। কিন্তু ছাত্রদের চেয়ে কম। কারণ সেই সময়ে অধিকাংশ পরিবারই মেয়েদের তুলনায় ছেলেদেরকে শিক্ষাগ্রহণে বেশি সুযোগ দিত। যদি সেই সময়ে মেয়েদের শিক্ষার হার আরো বেশি থাকতো তাহলে ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ আরো ব্যাপক হতে পারতো।

☐ **পঞ্চমত ঃ**

ভাষা আন্দোলন ও আন্দোলনের কর্মসূচি সম্পর্কে অধিকাংশ ছাত্রী অবগত ছিল। কিন্তু অনেক ছাত্রীই ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জেনেছে, শুনেছে এবং কর্মকাণ্ড দেখছে কিন্তু সক্রিয় অংশগ্রহণ করেনি। তাই এটাকে সচেতনতার অভাব ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

☐ **ষষ্ঠত ঃ**

নিরপত্তাহীনতার কথা চিন্তা করেও অনেকে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি। পুলিশ কর্তৃক নির্যাতন ও শ্লীলতাহানীর ভয়ে অনেক ছাত্রীই আন্দোলনে অংশগ্রহণে আগ্রহী ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা ঃ

সীমিত পরিসরে গবেষণা পরিচালনা করে ছাত্রীদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিরূপণ করা একটি কঠিন ব্যাপার। তবে এর মধ্যে থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গন ও ভাষা আন্দোলন ছাত্রীদের যে বলিষ্ঠ পদাচারণা তার সুপষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেশের সঠিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ, বিশেষ করে সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন একান্ত আবশ্যক। তাই উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে তা খুঁজে বের করার চেষ্ট করেছি। এ লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলো যার আলোকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের ছাত্রীসমাজ উপকৃত হবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী।

- ভাষা আন্দোলনের মর্যাদাকে রক্ষা ও লালন করার জন্য সর্বস্তরের বাংলার প্রচলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- সবার উপর মানুষ সত্য তার উপর দেশ- এ কথাটি বাণী হিসেবে গ্রহণ করে মূল্যবোধকে আরো শক্তিশালী করতে হবে।
- বাংলা ভাষাকে বিশ্বের সকল জাতির কাছে পরিচিত করার জন্য বিশ্বায়নের দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে।
- ধর্মের জন্য মানুষ নয়-মানুষের জন্য ধর্ম বাস্তব ক্ষেত্রে এর সকল প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজনীতি থেকে ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ দূর করে, জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করতে হবে।
- ভাষার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখতে হলে অপসংস্কৃতির কাছে নত হওয়া যাবে না।
- নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন নারী শিক্ষা। নারীর শিক্ষার হারকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য বাস্তব প্রয়োগ উপযোগী শিক্ষা প্রদান করতে হবে।
- বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের জন্য পৃথিবীর দ্বার উন্মুক্ত আর তারা যেন এর সদ্ব্যবহার করে।
- অনেক আন্দোলনের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ। জাতির কাছে এর সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে হবে।
- ছাত্রীরা হবে আদর্শবাদী। তারা যেন দায়িত্ব ও কর্তব্য ও নৈতিকতাকে কোনো ক্রমেই বিসর্জন না দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

- বাঙালীর শাশ্বত মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সর্বোপরি ভাষাকে রক্ষা, লালন ও চর্চা করা সকলের দায়িত্ব।
- বই মানুষের মেধাকে বিকশিত করে। তাই বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বইকে প্রাধান্য দিতে হবে।
- নারী উন্নয়নের জন্য নারী পুরুষের বৈষম্যকে প্রতিহত করতে হবে সর্বাগ্রে।
- অন্য ভাষা সংস্কৃতিকে জানা বা চর্চা করা অপরাধ নয়, কিন্তু নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে অবমূল্যায়ন করে নয়।
- নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যাতে নারীর সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে।
- ছাত্রীদের কাজের মূল্যায়ন স্বরূপ ভালো কাজের প্রশংসা করলে তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আরো বৃদ্ধি পাবে।
- নারীদের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান অসহযোগিতা ও দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের অবসান করতে হবে।
- জাতীয় নীতি-নির্ধারণে নারী ও পুরুষদের মধ্যে সমান অধিকার দিতে হবে।
- ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সেহেতু ইংরেজি তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে বাংলা মাস হিসেবে ৮ ফাল্গুন হওয়া উচিত।
- বাঙালির দিনের শুরু সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাই প্রভাতফেরি বা শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন পশ্চিমা রীতিতে গভীর রাতে না হয়ে ভোর বেলা হওয়া উচিত।

মূল্যায়ন ঃ

গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে আমি উপলব্ধি করলাম যে, ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এবং মেয়েদের অংশগ্রহণ গবেষণার এতো ক্ষুদ্র পরিসরে শেষ করা যয় না। তাদের নাম কখনো ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যাবে না। তাদের অক্লান্ত ত্যাগ ও পরিশ্রম বাংলার ইতিহাসে আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আজো আমাদের মনে করিয়ে দেয় রক্ষণশীলতা যুগে বাঙালি নারী জাগরণের উন্মেষের কথা। অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে বের হয়ে মেয়েরা তখন সবেমাত্র বাইরের মুক্ত ও আলোকিত বৃহত্তর অঙ্গনে এসে কেবল দাঁড়িয়েছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মেয়ের সংখ্যা তখনো কম। সেই সময়ে স্বাধিকার অর্জনে মেয়েরা সচেতন হয়ে ওঠে। এবং মাতৃভাষার প্রশ্নে তারা একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে ঝাঁড়িয়ে পড়ে। ভাষা আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে তারা নির্যাতনের স্বীকার হয়। ভাষা আন্দোলনকে সফল করার জন্য তারা কারাবরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাই এ আন্দোলনকে নারী নেতৃত্বের সূচনালগ্ন বলা যায়।

উপসংহার ঃ

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত বহু আন্দোলন হয়েছে। স্বাধিকারের দাবিতে, অন্ন-বস্ত্রের দাবিতে, অত্যাচার-নির্যাতন প্রতিরোধের দাবিতে বহু নিপীড়িত জাতি বুকের রক্ত দিয়ে নতুন ইতিহাসও রচনা করেছে। কিন্তু ভাষার জন্য আন্দোলন করে জীবন দিয়েছে এমন জাতি পৃথিবীতে আর একটাও নেই। পৃথিবীর কোনো জাতিকেই ভাষার জন্য গুলি করে হত্যা করা হয়নি। বেয়োনটের সামনে তরুণ যুবকদের বুক পেতে দিতে হয়েছে এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন বিরল ঘটনা শুধুমাত্র বাঙালি জাতির ক্ষেত্রেই ঘটেছে। তাই ২১ ফেব্রুয়ারির বছরান্তে আমাদের এ কথাগুলোই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মহান ভাষা আন্দোলনের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে বাঙালির জাতীয়তাবাদ সংক্রান্ত চিন্তাধরায় পরিবর্তনের সূচনা হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের মায়াজালে বাঙালিরা যে তথাকথিত ধর্মাশ্রিত পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদের মোহে আবিষ্ট হয়েছিলো তা ফিকে হয়ে আসতে থাকে ভাষা আন্দোলনের ফলে। ফলে বাঙালি সত্তার বিকাশের সূচনা হয়। ইরান, তুরান, আরব ভূমির পরিবর্তে বাঙালি নিজ ভূমিতে পাই আপনার উৎসের সন্ধান। ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের যাত্রা শুরু হয়-আর এ জাতীয়তাবাদই বাঙালি জাতিকে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁড়িয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা যোগায়। আর ভাষা আন্দোলন ছাড়া সম্ভব হতো না।

ভাষা আন্দোলন বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম সফল সংগ্রাম। আর তাই এ আন্দোলন পরবর্তীতে প্রতিটি আন্দোলনে একটি মাইলফলকের মতো কজ করেছে। মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয়েছে সেই সংগ্রামের মাধ্যমেই জনসাধারণ বুঝতে শিখেছে যে, শোষকের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে রুখে না দাঁড়ালে অধিকার আদায় স্বপ্নাতীতই থেকে যায়। আর এর জন্য অবলীলায় রক্ত ঝরাতে হয়। পরবর্তীতে এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েই ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ করা বাংলার জনগণের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এখনও এদেশের জনসাধারণ সকল স্বৈরাচারী অপশক্তির বিরুদ্ধে সব সময় আত্মসচেতন হয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকার এবং দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সদা সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে। অতীতের ভাষা আন্দোলনের সফল সংগ্রামই তাদেরকে বর্তমান সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

১৯৫২ সালের একুশ মানে সংগ্রাম, একুশ মানে জাগ্রত চেতনা। প্রতিবছর একুশ আসে নবচেতনা নিয়ে। এটি একটি লাল তারিখ। বর্তমানে 'একুশে' শব্দটি কিংবদন্তীর খ্যাতি পেয়েছে। কারণ একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে ইউনেস্কো। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের এ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটির সাধারণ পরিষদ সম্মেলনে সকল সদস্য দেশের সর্বসম্মতিক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব সাহিত্য দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ফলে এ স্বীকৃতি বাঙালি জাতিকে বীরের জাতি হিসেবে গোটা বিশ্বের কাছে আরেকবার পরিচয় করিয়েছে। আর এ স্বীকৃতির মাধ্যমে আমাদের গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাস আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে বলা যায়, আজকের একুশ স্বাধীন বাংলাদেশের একুশ; নতুনভাবে শপথ নেয়ার একুশ। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিনটি বাঙালির মানবাধিকারের চিরন্তন ধারক ও বাহক। একুশ আমাদের মুক্তির চেতনা। কিন্তু এ চেতনা আজ বাংলাদেশের সর্বত্র অনুসৃত হচ্ছে না। শঠতার রাজনীতি, দালালিচক্রের সংস্কৃতি পরায়ণ মনোভাব একুশের চেতনাকে ম্লান করে দিচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে একুশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব যাদের তারাও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। তাদের এ সিদ্ধান্ত হীনতাকে মাটিচাপা দিতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে সচেতন করে গড়ার জন্য ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

সাক্ষাৎকারের ব্যবহৃত প্রশ্নমালা-

প্রশ্ন ১ঃ ১৯৫২-তে আপনার বয়স কত ছিল?

প্রশ্ন ২ঃ ১৯৫২ সালে আপনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন?

প্রশ্ন ৩ঃ বর্তমানে আপনার পেশা কি?

প্রশ্ন ৪ঃ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আপনার প্রথম অনুভূতি কি রকম ছিল?

প্রশ্ন ৫ঃ ভাষা আন্দোলনের পর্যায় ছিল দুটি, (১) ১৯৪৭-১৯৪৮ এবং (২) ১৯৫২-১৯৫৬- আপনি কোন পর্যায়ে ছিলেন?

প্রশ্ন ৬ঃ কবে, কখন এবং কোথায় প্রথম নিজেকে আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করলেন?

প্রশ্ন ৭ঃ আপনার সাথে আর কে কে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

প্রশ্ন ৮ঃ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিনের বর্ণনা করুন?

প্রশ্ন ৯ঃ ঘটনার পরবর্তীতে আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

প্রশ্ন ১০ঃ শহীদদের প্রতি প্রথম কোথায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন?

প্রশ্ন ১১ঃ ভাষা আন্দোলনের জন্য আপনার সামাজিক অবস্থা কতটা সহায়ক ছিল?

প্রশ্ন ১২ঃ আন্দোলনের জন্য পরিবার থেকে কতটুকু উৎসাহ পেয়েছেন?

প্রশ্ন ১৩ঃ ১৯৫২ সালের পরবর্তী ফলাফলগুলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল কি?

প্রশ্ন ১৪ঃ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ছিল বলে মনে করেন?

প্রশ্ন ১৫ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রীদের সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

প্রশ্ন ১৬ঃ ভবিষ্যৎ ছাত্রীদের কিভাবে দেখতে চান?

প্রশ্ন ১৭ঃ ছাত্রীদের চেতনা জাগ্রত করবে এমন কোন উপদেশ দিন-

প্রশ্ন ১৮ঃ জাতির কাছে আপনি কি আশা করেন?

প্রশ্ন ১৯ঃ ভাষা আন্দোলন যেহেতু বাংলা ভাষার জন্য সুতরাং ২১ ফেব্রুয়ারি না হয়ে বাংলা মাস ৮ ফাল্গুন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয় কি?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আ-

আজাদ, হুমায়ূন (১৯৮৮); "তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষা বিজ্ঞান; ঢাকা।

আজাদ, হুমায়ূন (১৯৮৪); "বাঙালা ভাষা" (১ম ও ২য় খণ্ড); ঢাকা।

আজাদ, হুমায়ূন (১৯৯০); "ভাষা আন্দোলন";ঢাকা।

আজাদ, হুমায়ূন (২০০৬); "একুশ আমাদের অঘোষিত স্বাধীনতা দিবস"; ঢাকা।

আহাম্মদ, রফিক (২০০২); "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও উত্তর প্রভাব";ঢাকা।

আব্দুল্লাহ, তুষার, সম্পাদক (১৯৯৭); "বাহান্নর ভাষা কন্যা"; ঢাকা।

আখতার, ফরিদা, সাইদা আকতারও সীমা দাস সীমু (সম্পাদনায়); (১৯৯৯); শত বছরে বাংলাদেশের নারী, ঢাকা।

আহাদ, অলি (১৯৮২); "জাতীয় রাজনীতিঃ ১৯৪৫-১৯৭৫"; ঢাকা।

ই-

ইসলাম, মোহাম্মদ আশরাফুল; সম্পাদিত (২০০২); "ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি স্মারক";ঢাকা

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল, সম্পাদিত; (২০০০); আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন, ঢাকা।

ইসলাম, রফিকুল; (২০০৬); বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঢাকা।

ইয়াসমিন, ফরিদা; (২০০৫); ভাষা আন্দোলন ও নারী, ঢাকা।

ক-

কাসেম, আবুল অধ্যাপক (১৯৫৪); " একুশ দফার রূপায়ন"; ঢাকা।

কামাল, মোসতফা (১৯৮৭); "ভাষা আন্দোলন সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন"; ঢাকা।

চ-

চক্রবর্তী, রতন লাল; (১৯৮৭) ভাষা আন্দোলনের দলিলপত্র, ঢাকা।

ব-

বেগম, মালেকা, (১৯৮৯, ২০০২); "বাংলার নারী আন্দোলন", ঢাকা।

বেগম, মালেকা; (১৯৯৮-); "রাজপথে জনপথে সুফিয়া কামাল", ঢাকা।

বেগম, মালেকা; (২০০১); "আমি নারী", ঢকা/. সৈয়দ আজিজুল হক।

বেগম, মালেকা; (২০০২); "নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক", ঢাকা।

বার্ণিক এম. এ. (২০০৫); " রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ঘটনা প্রবাহ প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ"; ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ফ-

ফাল্গুনী, অদিতি; (১৯৯৭); "বাংলার নারী আন্দোলনের পাঁচ দশক", ঢাকা।

ম-

মুকুল, এম. আর. আখতার; (১৯৮৬); "ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা", ঢাকা।
মুকুল, এম. আর. আখতার; (১৯৮৬); "বাহান্নর জবানবন্দী"; ঢাকা।
মতিন, আব্দুল (১৯৮৬); "ভাষা ও একুশের আন্দোলন"; ঢাকা।

র-

রহমান, হাসান হাফিজুর (১৯৮২); "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ-দলিল পত্র (১ম ও ২য় খণ্ড)"; ঢাকা।
রশিদ, ড. হারুন-অর; (২০০১); বাংলাদেশ রাজনীতি ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন (১৭৫৭-২০০০), ঢাকা।
রেজা, সি. এম. তারেক; (২০০৪); ভাষা আন্দোলনের সচিত্র ইতিহাস, ঢাকা।

স-

সরকার, পবিত্র (২০০৩); "ভাষা প্রেম ও ভাষা বিরোধ"; কলকাতা।

হ-

হেলাল, বশীল আল; (১৯৮৫); "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস", ঢাকা।
হোসেন, আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন; (২০০০); "ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস", ঢাকা।
হান্নান, ড. মোহাম্মদ; (২০০০); "বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস", ঢাকা।
হক, আব্দুল (১৯৭৬); "ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব"; ঢাকা।
হাসানাৎ, আবুল (১৯৪৪); " বাংলা ভাষার সংস্কার"; ঢাকা।
হাফিজ, বিন আসাদ (১৯৯০); " ভাষা আন্দোলন ও ডান-বাম রাজনীতি"; ঢাকা।
হান্নান, ডঃ মোহাম্মদ (২০০০) "একুশে ফেব্রুয়ারী জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক"; ঢাকা।

উ-

উমর, বদরুদ্দীন; (১৯৮৪); ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল (১ম খণ্ড), ঢাকা।
উমর, বদরুদ্দীন; (১৯৮৫); ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল (২য় খণ্ড), ঢাকা।
উমর, বদরুদ্দীন; (১৯৭০); পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন, রাজনীতি (১ম খণ্ড) ঢাকা।

পত্রিকা ঃ

দৈনিক ইত্তেফাক, একুশের বিশেষ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি, (১৯৭৪-২০০৭), ঢাকা।
দৈনিক দিনকাল, একুশের বিশেষ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি; (১৯৯৫-২০০০), ঢাকা।
দৈনিক ভোরের কাগজ, একুশের বিশেষ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি; (১৯৯৮-২০০১), ঢাকা।
দৈনিক সংবাদ, একুশের বিশেষ সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি; (১৯৯৮-২০০৪), ঢাকা।
দৈনিক জনকণ্ঠ, একুশের সুবর্ণ জয়ন্তী, ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারি, (২০০২), ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ ঃ

বেবী মওদুদ-বাংলাদেশের নারী।
হামিদা রহমান-অধিকার আন্দোলনে নারী সমাজ।
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৮৬"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৮৭"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৮৮"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৮৯"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯০"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯১"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯২"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯৩"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯৪"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯৫"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯৬"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯৭"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯৮"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ১৯৯৯"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে প্রবন্ধ ২০০০"
বাংলা একাডেমী, "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসঃ কয়েকটি দলিল" ১৯৮৩; ঢাকা।

স্মারকগ্রন্থ ঃ

বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৮৭"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৮৮"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৮৯"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৯০"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৯১"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৯২"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৩"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৪"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৫"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৬"
বাংলা একাডেমী প্রকাশিতঃ "একুশে স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৭"